স্বস্তিকা

দাম : পাঁচ টাকা

১ আগষ্ট - ২০১১, ১৫ শ্রাবণ - ১৪১৮ ।। ৬৩ বর্ষ, ৪৬ সংখ্যা

মুম্বাইয়ে হামলা কেন বারবার?

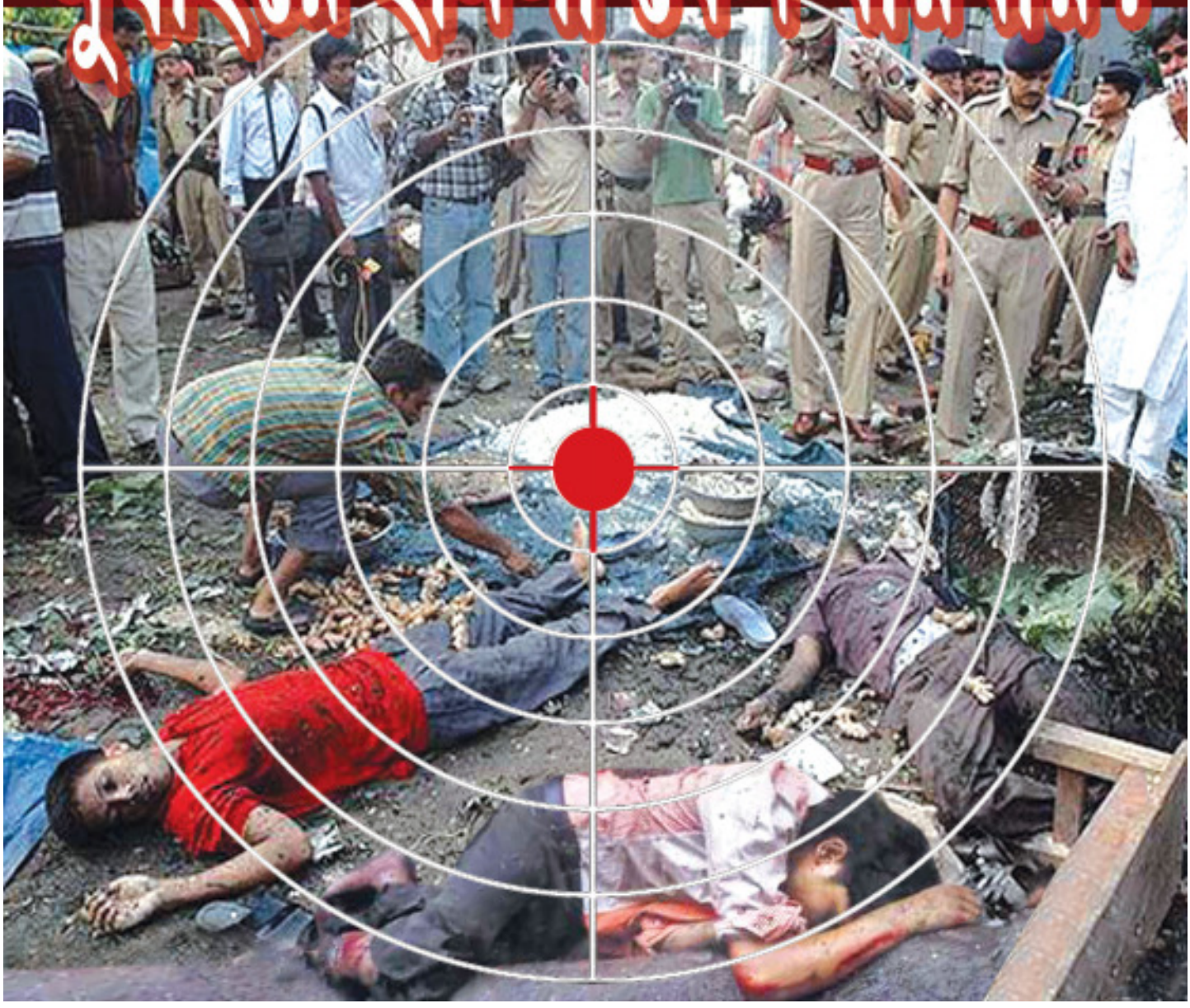

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❑

সংবাদ প্রতিবেদন ❑

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চিহ্নিত
দোষীদের শাস্তি হবে তো? ❑

চুক্তির পরই গুরুংদের অন্য রূপ, তরাই না পেলে জিটিএ নির্বাচন নয় ❑

অধিবক্তা পরিষদের রাজ্য সম্মেলন তারাপীঠে ❑

সমৃদ্ধ ভারত ও সন্ন্যাসী বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তা ❑ সাধন কুমার পাল ❑

আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী, বিজেপির উদ্যোগ ❑ চন্দন মিত্র ❑

রক্তাক্ত মুম্বাই, যোগসূত্র কলকাতা ❑ বাসুদেব পাল ❑

দেশজুড়ে সন্ত্রাসের লক্ষ্য কি কাশ্মীর? ❑ ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ❑

সন্ত্রাসবাদী হানায় বিধ্বস্ত মুম্বাইয়ের হীরা শিল্প ❑

দীর্ঘ বঞ্চনার পর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃত গৌরব
ফেরাতে উদ্যোগী বিশ্বভারতী ❑

চল্লিশ বছর আগের এক স্মৃতি এবং সংবাদপত্র ❑ রমাপ্রসাদ দত্ত ❑

স্বামীজী'র গুরুভক্তি ❑ স্বপন কুমার আইচ ❑

শহিদের রক্তে নেতানেত্রী তখ্‌তে ❑ শিবাজী গুপ্ত ❑

অন্য ধারার ছবি 'ইচ্ছে' ❑ বিকাশ ভট্টাচার্য ❑

নিয়মিত বিভাগ

এইসময় : ❑ অন্যরকম : ❑ চিঠিপত্র : ❑
সু-স্বাস্থ্য : ❑ নবাঙ্কুর : ❑ কেরিয়ারের ঠিক-ঠিকানা : ❑ সমাবেশ-সমাচার : ❑ শব্দরূপ : ❑ চিত্রকথা : ❑

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

মুম্বাইয়ে হামলা কেন বারবার?
— ১৫-১৭

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৩ বর্ষ ৪৬ সংখ্যা, ১৫ শ্রাবণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৩, ১ আগষ্ট - ২০১১

দাম : ৫ টাকা

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS
RNP-048/LPWP-028/2010-12

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail :
swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

সম্পাদকীয়

সন্ত্রাসের ভাঁড়ার ঘর

কাশ্মীর সন্ত্রাসবাদীদের স্বর্গরাজ্য হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ ধীরে ধীরে সন্ত্রাসবাদীদের কবলে চলিয়া যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গ এখন সন্ত্রাসবাদীদের করিডর হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইতিপূর্বে দেশে যতগুলি সন্ত্রাসমূলক অপরাধ হইয়াছে, অপরাধী হয় পশ্চিমবঙ্গ হইতে সে রাজ্যে গিয়াছে নতুবা অপরাধ করিয়া অপরাধী পশ্চিমবঙ্গ হইতে অন্যত্র পলায়ন করিয়াছে। সম্প্রতি মুম্বাই বিস্ফোরণে অভিযুক্ত অপরাধীও নাকি পশ্চিমবঙ্গ হইতে সেই রাজ্যে গিয়াছিল। এই সূত্রেই জানা গিয়াছে কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মূল ঘাঁটি এখন পশ্চিমবঙ্গ। মুম্বাই নাশকতায় হারুণ তৌকিত ও আবদুল্লা ওরফে নাটার হদিশ করিতে গিয়া, কলকাতায় মুজাহিদিনের মূল ঘাঁটির কথা জানিতে পারিয়াছেন গোয়েন্দারা। হারুণ ও আবদুল্লা দুজনেই কলিকাতার বাসিন্দা। হারুণ মেটিয়াবুরুজ নিবাসী আর আবদুল্লার বাড়ী বেনিয়াপুকুরের মফিদুল ইসলাম লেনে। ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের শীর্ষকর্তা আমির রেজা খানের নির্দেশে গত দুই বছর ধরিয়া কলিকাতায় কার্যকলাপ চালাইতেছে এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটি। কিন্তু মুসলিম ভোটের জন্য লালায়িত কোনও রাজনৈতিক দলই এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করে নাই। রাজনৈতিক দলগুলির প্রশ্রয়ে বাংলাদেশের হরকত উল জিহাদি ইসলামির (হুজি) সঙ্গে আই এম-এর যোগাযোগও স্থাপিত হইয়াছে। যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছে জঙ্গলমহলের মাওবাদীদের সঙ্গেও। গত ভোটের পূর্বে দক্ষিণ শহরতলির মল্লিকপুরে এই তিন গোষ্ঠীর আলাপ আলোচনাও হইয়াছিল। এই রাজ্যের বহু যুবককে ইতিমধ্যেই নাশকতার জন্য নিয়োগ করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ আজ বারুদের স্তূপে পরিণত হইয়াছে। যে কোনওদিন যে কোনও সময় অঘটন ঘটিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকিবে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক দলগুলি যে গতিতে মুসলিম তোষণের প্রতিযোগিতা চালাইতেছে তাহাতে যে এই পরিণাম ঘটিবে তাহা প্রত্যাশিতই ছিল। বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যতত্রত মসজিদ ও মাদ্রাসা তৈরি হইয়াছে। এই মাদ্রাসা ও মসজিদগুলিতে জেহাদী শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। রাজ্য সরকার কেবল মাদ্রাসার পেছনেই খরচ করিয়াছে প্রায় ছয়শো কোটি টাকা।

মুর্শিদাবাদ ও মালদহের সীমান্ত অঞ্চলে অবৈধ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ফলে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হইয়াছে। ভোটের লোভে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদেরও রেশন কার্ড দেওয়া হইয়াছে, ভোটার লিস্টে নাম তুলিতে সাহায্য করা হইয়াছে। আজ রাজনৈতিক পরিবর্তন হইলেও এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নাই, বরঞ্চ আরও বেশি সুযোগ সুবিধা পাইবার ফলে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি বিপুল উৎসাহ পাইয়াছে। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে উর্দুভাষার স্বীকৃতির ফলে কেবল বাংলাদেশী জঙ্গিগোষ্ঠী নয়, অন্য দেশের জঙ্গিদেরও সুবিধা হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গে গা ঢাকা দিবার। রাজ্য সরকারের মাদ্রাসাগুলিকে স্বীকৃতি দিবার প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগাইয়া ইতিমধ্যেই নতুন মাদ্রাসা তৈরির কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সর্বোপরি সংখ্যালঘু মুসলিমদের সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বাসের সুযোগ পুরোমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে জঙ্গিরা। সম্প্রতি একটি জনস্বার্থ মামলায় সুপ্রীম কোর্টে অভিযোগ করা হইয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। হুজি সিমির সদস্যরা এই রাজ্যে নিরাপদে বাস করিতে পারেন। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা চোরাপথে বিস্ফোরক লইয়া এই রাজ্যে আসিতেছে। এইখানে মূলত জঙ্গিরা আশ্রয় লইতেছে কলকাতা ও সীমান্তবর্তী জেলার মাদ্রাসা ও মসজিদসহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে জঙ্গিরা আশ্রয়স্থল হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। সুপ্রীম কোর্ট ইতিমধ্যেই জঙ্গি অনুপ্রবেশ রাখিতে পশ্চিমবঙ্গ কি ব্যবস্থা লইয়াছে তাহা জানিতে চাহিয়াছে। এত কিছুর পরেও যখন দিগ্বিজয় সিং অভিযোগ করিয়া থাকেন আর এস এস নাকি বোমা তৈরির কারখানা গড়িয়াছে, তখন জঙ্গিগোষ্ঠীগুলির প্রধান ভারতীয় পৃষ্ঠপোষক কে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। আফজল গুরু, কাসভের মতো জঙ্গিদের গডফাদার যে এইরকম দেশীয় কুলাঙ্গারই হইবে তাহা এতদিনে দেশবাসীর নিশ্চয়ই বোধগম্য হইয়াছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

ভারতের ধর্ম শুধু পরকাল আর পরলোক আশ্রয় করে আছে, এ ধারণা যে কতবড় মিথ্যা, তা স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অগ্নিময়ী বাণীর ভিতর দিয়ে ও চরম আত্মোৎসর্গের সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যা নিবেদিতা সেই চিরন্তন ধর্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের মাধুর্যভরা ছোট-খাটো আচার-অনুষ্ঠানের যোগ কত গভীর, সেটি তাঁর রচনায়, তাঁর সেবায় প্রমাণ করে গেছেন।

—কালিদাস নাগ

জঙ্গলমহলে আস্থা হারাচ্ছেন মমতা সক্রিয় মাওবাদীরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ আগস্ট, ২০১০ : লালগড় হাইস্কুলে মমতা ব্যানার্জীর র‍্যালি। কাতারে কাতারে লালগড়ের মানুষ এসেছেন সেই র‍্যালিকে সফল করতে।

১২ জুলাই ২০১১ : ঝাড়গ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লালগড় হাইস্কুল থেকে দূরত্ব মেরেকেটে ৫০ কিমি। প্রায় বছরখানেক আগে বিরোধী নেত্রীর র‍্যালিতে যোগদান করা সেই মানুষগুলো সেদিন মুখ্যমন্ত্রী'র জনসভায় আশ্চর্যজনকভাবে অনুপস্থিত। জনসভায় মমতা ব্যানার্জী তাঁর 'মাওবাদী বন্ধু'দের প্রতি অস্ত্র ত্যাগ করে, রাজ্যের জন্য বন্দুক তুলে নেবার আহ্বান জানান। পুলিশে তাদের জন্য ১০,০০০ চাকরির কথা ঘোষণা করেন। মাত্র হাজার চারেক মানুষের সমাগম হয়েছিল সেদিন ঝাড়গ্রাম শহরে মুখ্যমন্ত্রীর র‍্যালিতে। অথচ তার সপ্তাহ দু'য়েক আগেই সন্ত্রাস, দুর্নীতি, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন-বিরোধী গণতান্ত্রিক মঞ্চের ডাকা মিছিলে ২০,০০০-রও বেশি জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। মেদিনীপুর শহরে বিদ্যাসাগর হল ময়দানে জঙ্গলমহলের বিভিন্ন সংগঠন নিয়ে গঠিত ওই মঞ্চের ছাতার তলায় পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির (পি সি এপিএ) নেতা-কর্মীদেরও দেখা গিয়েছিল।

ধর্মানী

নিয়তি মাহাতো

এই রিপোর্টগুলো থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হয় যে নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে জঙ্গলমহলের মানুষ অতি দ্রুত আস্থা হারাচ্ছেন মমতা ব্যানার্জী'র ওপর থেকে। ধরা যাক ধর্মানী'র কথা। ৬৫ বছরের এই বৃদ্ধা থাকেন দু'টি নাতি-নাতনীকে নিয়ে। নাতি ভূপতি-র বয়স ১১, সারাক্ষণই মনমরা হয়ে বসে থাকে এবং তার দিদি ললিতা গতবছরের ২২ ফেব্রুয়ারি তাদের বাবা মারা যাবার পর বোর্ডের পরীক্ষায় পরপর দু'বার ফেল করে পড়াশুনোই ছেড়ে দেয়। পুলিশকর্মী লালমোহনের বিধবা স্ত্রী ধর্মানী। তার একমাত্র ছেলে ছিল জনসাধারণের কমিটি'র সভাপতি। পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা যায় সে। ধর্মানী-র অভিযোগ যে তাঁরা এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ পাননি। মৃত স্বামী'র পেনশনের সামান্য টাকাটুকুই বলতে গেলে তাঁর একমাত্র সম্বল। ছত্রধর মাহাতোর স্ত্রী জনসাধারণের কমিটির প্রাক্তন সম্পাদিকা নিয়তি মাহাতো গ্রেপ্তার হন ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে। তাঁর এখন বক্তব্য—''মমতা জঙ্গলমহলে আসতেই পারেন। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ার জনজাতি অধ্যুষিত জঙ্গলমহলে তিনি আসতেই পারেন। কারণ জনসাধারণের কমিটির সমর্থন তাঁর পেছনে রয়েছে।'' এরপরেই নিয়তি'র বিস্ফোরক মন্তব্য— ''বুদ্ধদেব ভট্টচার্যের সরকারের সঙ্গে মমতা ব্যানার্জীর সরকারের কোনও তফাত দেখছি না।''

২০১০-এ মমতা ব্যানার্জীর লালগড় র‍্যালি সফল করার ব্যাপারে অন্যতম কারিগর ছিল জনসাধারণের কমিটির বর্তমান সম্পাদক মনোজ মাহাতো। গত ১ জুলাই তাকে গ্রেপ্তারের পর দীর্ঘ ৮ মাস বাদে গত এপ্রিলে মুক্তি পায় সে। ২০১০-এ একাই হাজার পঞ্চাশেক মানুষকে মমতা ব্যানার্জীর মিছিলে সামিল করেছিল সে। কিন্তু নতুন সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা হারাচ্ছে দ্রুত। নিয়তি মাহাতো'র বক্তব্য— ''আমরা মমতাকে বিশ্বাস করি না। তিনি জঙ্গলমহলে চাঁদ আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যেমনটা ঠিক বুদ্ধদেববাবু করেছিলেন এবং যৌথবাহিনীও আমাদের ওপর থেকে প্রত্যাহার করা হয়নি।''

রাজনৈতিক মহলের ধারণা সমস্যাটা ঠিক এখানেই। মমতা ব্যানার্জী পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এলেও কেন্দ্রীয় সরকার অন্তত লালগড়ের ক্ষেত্রে কোনও নীতি বদল করেনি। উপরন্তু মমতা ব্যানার্জী ক্ষমতায় আসার সুবাদে জঙ্গলমহলে ফের মাওবাদীরা সক্রিয় হয়েছে। কিষেণজী'র মতো নেতারা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। সব মিলিয়ে তৃণমূলী শাসনে অবস্থা ফেরার যে আশা জঙ্গলমহলের মানুষ দেখেছিলেন, দু'মাস অতিক্রান্ত হবার পরেও তার ছিটেফোঁটা পূরণ হবার আশাও করছেন না সেখানকার মানুষ। ফলে তাদের গ্রাস করছে হতাশা। শুধু প্রতিশ্রুতি'র বন্যায় আর ভাসতে নারাজ জঙ্গলমহলের জনজাতি'রা। ১৩ জনের কমিটি গড়ে কলকাতা হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে সেই কমিটির মাথায় বসিয়ে গত ২০ জুলাই যে ৫২ জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে, তাদের অধিকাংশই কোচবিহারের কামতাপুরী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, জঙ্গলমহলের একজনও নেই।

আসলে মাওবাদীদের তুরুপের তাস করে গত দু'বছরে যে রাজনৈতিক খেলাটা দেখেছেন লালগড়ের সাধারণ মানুষ, তাতে করে সিপিএম-কে যে ট্রিটমেন্ট তারা দিয়েছেন আগামীদিনেও তৃণমূলের ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় হবে বলে মনে করার কোনও কারণ নেই। অন্তত নিজেদের অস্তিত্ব কায়েম রাখতে মাওবাদীরা তো তাই চায়। রাজনীতির খেলায় মাওবাদীদের এই চাওয়ার সঙ্গে শাসককুলের (তা সে সিপিএমই হোক বা তৃণমূল) পাওয়াও যেন কোথাও একটা মিলে যাচ্ছে।

ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের একাংশ কি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে চাইছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুলাম নবি ফাই-এর পরিচালিত কাশ্মীরী আমেরিকান কাউন্সিল আয়োজিত মিটিং বা সেমিনারে যে সকল ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা এযাবৎ যোগ দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে কেন্দ্র সরকারকে বিস্তারিত তথ্যাদি জানানোর দাবী জানিয়েছেন বিজেপি-র অন্যতম শীর্ষ নেতা ডঃ মুরলী মনোহর যোশী। খবর হলো, কাশ্মীর বিষয়ে কেন্দ্র সরকারের নিযুক্ত মধ্যস্থতাকারী দিলীপ পদগাঁওকর, ভারতীয় বংশোদ্ভুত প্রবাসী অঙ্গনা চ্যাটার্জী প্রমুখ কাউন্সিলের 'আতিথেয়তা' গ্রহণ করেছিলেন। এইসব প্রমুখ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা ফাই-এর আয়োজিত সেমিনার মিটিং ইত্যাদিতে যোগ দিয়েছেন। গত ২০ জুলাই আমেরিকার ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (এফ বি আই) কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য গত দু'দশক ধরে পাকিস্তান যে খেলা খেলে চলেছে তা ফাঁস করে দিয়েছে। এফ বি আই ৪৩ পৃষ্ঠার এক হলফনামায় আদালতে অভিযোগ করেছে যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ও তাদের গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার নীতিকে প্রভাবিত করার জন্য ৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। এই সূত্রে ওয়াশিংটন কেন্দ্রিক অলাভজনক সংগঠন কাশ্মীরী আমেরিকান কাউন্সিল-এর ডাইরেক্টর গুলাম নবি ফাই-কে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। এর ফলে আই এস আই-এর কদর্যময় ভূমিকাটা আবার সামনে এসে পড়েছে। কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা গুলাম নবি ফাই যে আই এস আই-এর প্রভাব বিস্তারের কাজে অন্যতম মদতদাতা তা তাকে গ্রেপ্তার করার পর স্পষ্ট হয়ে গেছে। কাশ্মীরে সীমান্ত সমস্যার সমাধান গণভোটের মাধ্যমেই হওয়া উচিত— এই মর্মে জনমত গঠন অর্থাৎ পাকিস্তানের অভিলষিত নীতি মিটিং-সেমিনার ইত্যাদি অলাভজনক কাজকর্মের মাধ্যমে কার্যকর করাই ছিল এই কাউন্সিলের উদ্দেশ্য। একাজে অর্থাৎ কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার নীতিকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে আই এস আই যে সফল তার প্রমাণ হলো— আমেরিকার ইন্ডিয়ানা রাজ্যের রিপাবলিকান সেনেটের ডন ব্রাটন (Don Burton) এই বাবদ ২০ হাজার ডলার ফাই-এর কাছ থেকে নিয়েছেন। খুব সঙ্গত কারণেই তাই প্রশ্ন উঠছে, যেসব ভারতীয়রা কাউন্সিলের আয়োজিত মিটিং বা সেমিনারে যোগ দিতেন তারাও এই টাকার হিস্যা পেতেন কিনা? এদের মধ্যে কয়েকজন শুধু 'আতিথেয়তা' লাভ করেছেন বলে ইতিমধ্যে স্বীকারও করেছেন। দেশের স্বার্থে এই সব ব্যক্তির মুখোশ খুলে দেওয়াটা তাই খুবই জরুরী এবং একারণেই বিজেপি এবিষয়ে কেন্দ্র সরকারের কাছে বিস্তারিত তথ্যাদি জানানোর দাবী জানিয়েছে।

অশুভ সম্পর্ক

- আই এস আই-এর এজেন্ট গুলাম নবি ফাই গত ২০ বছর ধরে কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে।
- গত তিন বছরে আই এস আই-এর অন্যান্য এজেন্টদের সঙ্গে ফাই ৪ হাজারবার ফোনে কথা বলেছেন।
- তার কাজে মদতকারী আমেরিকানদের সে ইতিমধ্যেই ২৩,০০০ ডলার দিয়েছে।
- ফাই এযাবৎ যে সব বিবৃতি দিয়েছে তার ৮০ শতাংশই আই এস আই-এর নির্দেশেই। সূত্র : দ্য পাইওনীয়ার

মোদী-র প্রশংসা করায় বরখাস্ত দেওবন্দের উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসা করায় সরে যেতে হলো দারুল উলুম দেওবন্দের ভাইস-চ্যান্সেলর মৌলনা গুলাম বাস্তানভী-কে। দেশের প্রধান বিরোধী দল ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে গত ২৪ জুলাই এই ঘটনাকে হতাশাজনক আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, নরেন্দ্র মোদী'র নেতৃত্বে গুজরাটের উন্নতি হচ্ছে— এই সত্যটা প্রকাশ করার জন্যই বাস্তানভী'কে নিপীড়ন ও অত্যাচারের শিকার হতে হলো। বিজেপি'র সর্বভারতীয় মুখপাত্র রাজীব প্রতাপ রুডি এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্তব্য করেন, ''বাস্তানভী-কে উপাচার্যের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া বাস্তবিকই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির কাছেই বড় আঘাত। যদিও এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরোয়া ব্যাপার, কিন্তু স্রেফ গুজরাটের উন্নয়নের প্রশংসা করায় যেভাবে কর্তৃপক্ষ একতরফা সিদ্ধান্ত নিলেন তা গভীর উদ্বেগে'র বিষয়।'' রুডি'র এই বক্তব্যের পাশাপাশি আর কোনও রাজনৈতিক দল-ই এনিয়ে মুখ খুলতে চায়নি।

বাস্তানভী

প্রসঙ্গত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং কাউন্সিলের চার সদস্য বাস্তানভী'র পাশে থাকা সত্ত্বেও দারুল উলুম দেওবন্দ কর্তৃপক্ষের নাছোড় মনোভাব মৌলবাদী মানসিকতা'র প্রতি প্রচ্ছন্ন সমর্থন বলেই মনে করা হচ্ছে। তথাকথিত 'সেকুলার' তকমাধারী রাজনৈতিক দলগুলো যেভাবে দেওবন্দের এই সিদ্ধান্তকে 'মৌনং সম্মতি লক্ষণম্'-এর মাধ্যমে সমর্থন করছে তাতে এদের বিরুদ্ধে মুসলিম মৌলবাদকে ইন্ধন যোগানোর অভিযোগ অনেকটাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো বলে তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা। বাস্তানভী এও বলেছিলেন যে গুজরাটের মুসলমানরা মোদী'র আমলে রাজ্যের যে সর্বাঙ্গীন উন্নতি হয়েছে তার অন্যতম ভাগীদার। তাঁকে সরিয়ে দেওয়ায় মোদীর আমলে গুজরাটের উন্নতি যেমন একদিকে সত্য বলে প্রমাণিত হলো, তেমনি অন্যদিকে মুসলমানদের উন্নতিও যে মোদীর রাজত্বে হয়েছে একথাও আর একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল বলে রাজনৈতিক মহলের ধারণা। রুডির মন্তব্য— 'মোদীর আমলে গুজরাটের উন্নতি হওয়া— এই সত্যটা না যোজনা কমিশন, না অন্য কোনও তথ্য-প্রমাণাদি, না গুজরাটের মানুষ কেউই অস্বীকার করেনি। তবু এর জন্য দারুল উলুম দেওবন্দের উপাচার্যকে যেভাবে 'বলি' দেওয়া হলো তার জন্য আমাদের লজ্জা হওয়া উচিৎ।'' তিনি আরও বলেন যে, এই হতাশা শুধু বিজেপি-র নয়, এই হতাশা তাঁদেরও যাঁরা শিক্ষা এবং 'রিলিজিয়ন'কে রাজনীতির উর্দ্ধে রেখে চিন্তা-ভাবনা করেন।

এদিকে মৌলানা গুলাম বাস্তানভী-কে দারুল উলুম দেওবন্দের উপাচার্য পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ায় তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়েছে তার পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাজ্য মহারাষ্ট্রের আক্কলাকুয়া গ্রামে। আসলে দক্ষিণ গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে মুসলিম সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও সচেতন বৃদ্ধি করতে তা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। গড়ে তুলেছিলেন আক্কলাকুয়া এডুকেশনাল কমপ্লেক্স। বাস্তানভী-র এতটা 'বাড়বাড়ন্ত' ও জনপ্রিয়তা দেওবন্দে তাঁর বিরোধীপক্ষের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলে। মোদী-র প্রশংসা তাই তাঁর বিরোধীপক্ষের কাছে তাঁকে পদচ্যুত করার প্রচেষ্টাকে আরও সহজ করে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের চিহ্নিত দোষীদের শাস্তি হবে তো ?

গূঢ়পুরুষের

কলম

বিগত বাম শাসনে রাজনৈতিক কারণে অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ খুন হয়েছেন। বামদল, বিশেষত সিপিএম, কোনওদিনই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক খুনের দায় নেয়নি। ফলে হত্যাকাণ্ডগুলির নেপথ্য ঘটনা রহস্যই থেকে গেছে। বামেদের চাপে পুলিশ তদন্ত ও ফাইল চাপা পড়েছে। নিহতদের পরিবার পরিজনদের কান্না বাংলার মানুষ শুনতে পায়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বিচার হবে। সেই প্রতিশ্রুতিমতো তিনি মোট ছয়টি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের ঘোষণা করেছেন। একইসঙ্গে এতগুলি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের দ্বিতীয় কোনও নজির এই রাজ্যে নেই। অতীতে ৩৫ বছর একছত্র রাজত্ব করার সুবাদে সিপিএম শাসকেরা (পড়ুন জ্যোতি বসু) বেশ কয়েকটি এমন তদন্ত কমিশন নিয়োগ করেছিল। কিন্তু সবটাই ছিল লোক দেখানো ভড়ং। বাম জমানার সব ক'টি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট চেপে দেওয়া হয়। ফলে অপরাধের জন্য দোষীরা শাস্তি পায়নি। সবই পণ্ডশ্রম হয়েছে। জ্যোতিবাবুর আমলে এইসব তদন্ত কমিশন গঠনের কারণ যাই হোক না কেন তার উদ্দেশ্য ছিল দলদাস পেটোয়া কিছু আমলাদের অবসরের পরেও ভাল রকম রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এই ব্যাপারে নমস্য ব্যক্তি ছিলেন প্রয়াত বিচারপতি হরিদাস দাস। জ্যোতিবাবুর আমলে গঠিত সমস্ত এক সদস্যের বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রধানের পদটি তাঁরই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। আমৃত্যু তিনি কোনও না কোনও তদন্ত কমিশনের প্রধান ছিলেন। কর্মজীবনে বিচারপতি হরিদাস দাসের নাম অধিকাংশ রাজ্যবাসীর অজানা ছিল। অবসর নেওয়ার পর জ্যোতিবাবুর অনুগ্রহে এবং হরিদাস দাস কমিশনের সুবাদে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। আশির দশকে তিনি একই সঙ্গে দু'টি তিনটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের প্রধান হিসাবে কাজ চালিয়েছেন। এমন নজির পশ্চিমবঙ্গে তো নেই-ই, সারা ভারতে আছে কিনা আমার জানা নেই। এমন একজন প্রতিভাবান মননশীল ব্যক্তির তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট জ্যোতিবাবুর সরকার ও তাঁর দল লুকিয়ে ফেলায় শিক্ষিত বাঙালি পড়ে দেখার সুযোগ হারিয়েছে।

ঘোষিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে যদি ওজনদার বাম নেতাদের দোষী বলে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তখন তিনি কী করবেন। দোষীদের কী বিচার করে শাস্তি দেওয়া হবে। এমন সব প্রশ্ন উঠছে কারণ, ঘোষিত ছয়টি তদন্তের ঘটনায় সিপিএমের হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী-নেতারা জড়িত।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছয়টি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের ঘোষণা করেছেন। যেমন, ১৯৭০ সালের ১৭ মার্চ বর্ধমানের সাঁইবাড়িতে পরিবারের চার সদস্যকে দিনের বেলা হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে নৃশংসভাবে হত্যা করার ঘটনা। সম্প্রতি নির্বাচিত সিপিএম বিধায়ক মোস্তাফা বিন কাসেমের রহস্যজনক মৃত্যু। চলতি বছরের ২৯ মে কলকাতার এম এল এ হোস্টেলের তিন তলা থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়। মোস্তাফার স্ত্রী নুর-ই- জাহান পার্কস্ট্রীট থানায় অভিযোগ দায়ের করেন যে তাঁর স্বামীকে রাজনৈতিক কারণে হত্যা করা হয়েছে। এই দুটি তদন্ত কমিশন গঠনের ঘোষণা ক্ষমতায় আসার প্রথম মাসেই করা হয়। এরপর ২১ জুলাই ব্রিগেডের সভায় আরও চারটি তদন্ত কমিশন গঠনের ঘোষণা করেন মমতা। ১৯৭১ সালে কলকাতার কাশীপুরের গণহত্যার ঘটনা। ১৯৯৩-তে কলকাতার রাজপথে যুব-কংগ্রেস কর্মীদের উপর গুলি চালনা। ১৯৯৯-এর জুনে পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনায় আদিবাসীদের মিছিলে দ্রুতগতিতে চলা ট্রাকের ঢুকে পড়া ও ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বহু মানুষের মৃত্যুর ঘটনা। এবং ওই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলারই দাসপুরের বিডিও কল্লোল শূরের অস্বাভাবিক মৃত্যু।

একই সঙ্গে এতগুলি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের ঘোষণা করে মমতা তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তবে প্রশ্ন উঠছে যে ঘোষিত তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে যদি ওজনদার বাম নেতাদের দোষী বলে চিহ্নিত করা হয়, তাহলে তখন তিনি কী করবেন। দোষীদের কী বিচার করে শাস্তি দেওয়া হবে। এমন সব প্রশ্ন উঠছে কারণ, ঘোষিত ছয়টি তদন্তের ঘটনায় সিপিএমের হেভিওয়েট প্রাক্তন মন্ত্রী-নেতারা জড়িত। এদের রাজনৈতিক খুঁটির জোর দিল্লি পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। কেন্দ্রে কংগ্রেস-সিপিএম আজও পরস্পরের বন্ধু। দুর্নীতির দায়ে ডি এম কে দল ইউ পি এ জোট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আগামী বছরে লোকসভার অন্তবর্তী নির্বাচন হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। সেক্ষেত্রে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড সিপিএমকে চটিয়ে আখের নষ্ট করবে না। এখন দেখার কংগ্রেস হাইকম্যান্ডকে উপেক্ষা করে দোষী সিপিএম নেতাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা মমতা করতে পারেন কিনা। না পারলে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনগুলি বাম জমানার মতোই লোক ঠকানো প্রহসন হবে।

চুক্তির পরই গুরুংদের অন্য রূপ

তরাই না পেলে জিটিএ নির্বাচন নয়

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

২১ জুলাই-এর শহীদ স্মরণে এবং তৃণমূলের বিজয় উৎসবে ব্রিগেড জনপ্লাবিত। একথা অনস্বীকার্য যে মমতা ব্যানার্জি এগারো-বারোটা দপ্তর হাতে রেখে সব দপ্তরেই দ্রুত কিছু একটা করার এক দুর্দমনীয় প্রয়াস চালাচ্ছেন। তবে এটা আবেগের স্রোতে গা-ভাসানো হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য এ-রাজ্যের প্রাক্তন চীফ সেক্রেটারী মণীশ গুপ্ত পরিকল্পনা মন্ত্রী। বোধ করি তিনিই একের পর এক পরিকল্পনা তৈরি করছেন। অপর দিকে সিপিএম পার্টি এক বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে। বামফ্রন্টের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সিপিএম পরিচালিত গণসংগঠনগুলি মৃতপ্রায়। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাস-ফেল তুলে দেওয়ার প্রস্তাবের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন সরকার বিদ্যুৎগতিতে একের পর এক সমস্যা সঙ্কট সমাধানের পথে পা-ফেলছেন। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিকিৎসক-কে সাসপেন্ড করা, স্বাস্থ্যসচিবকে অপসারণ করে দিয়ে সরকারি স্বাস্থ্য-পরিষেবার উন্নতির চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু সরকারি হাসপাতালে ঔষধ সরবরাহকারীদের ড্রাগ কন্ট্রোলের দুর্নীতি দূর করার ব্যবস্থা এখনও নেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের চক্র এবং দালালচক্রের রমরমা এখনও রয়েছে। শিক্ষা জগতে একের পর এক কমিটি তৈরি হচ্ছে। তৃণমূলের শিক্ষা-সেলের কর্তা তথা তৃণমূলের কোর-কমিটির সদস্য মানিক ভট্টাচার্যকে একের পর এক কমিটির সদস্য করা হয়েছে, সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানও করা হয়েছে। মানিকবাবুকে কমিটির সদস্য করা হলো, অথচ কমিটির চেয়ারম্যান সুনন্দ সান্যালকে কিছু না জানাতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছিলেন যে তিনি ভাইসচ্যান্সেলরদের 'শিক্ষাগত যোগ্যতা' বিচার করবেন। ইন্দিরা গান্ধী আরোপিত জরুরী অবস্থায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলরকে সঞ্জয় গান্ধীর উপাসনা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। তার ফল কী হয়েছিল তা সকলের জানা। বর্তমানে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় অবনমন সিপিএমের অবদান। বামফ্রন্টের 'ডিজুরো' বিদ্যালয়-শিক্ষামন্ত্রী এবং 'ডি-ফ্যাকটো' শিক্ষামন্ত্রীর দৌলতে শিক্ষা-ব্যবস্থা এক ভয়াবহ অবস্থায় পরিণত হয়েছিল।

কমিউনিস্টদের আর এক অবদান হলো— দার্জিলিং-এর পাহাড়ি সমস্যা। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম পলিটব্যুরো সদস্য ডঃ গঙ্গা অধিকারীর 'জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার' পুস্তিকাতে পাকিস্তান দাবির সমর্থনে যুক্তি খাড়া করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী গোর্খাদের দাবিও সমর্থনযোগ্য। ১৯৫১ সালের অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির পার্টি- কর্মসূচীতে গোর্খাদের পৃথক জাতিসত্তাকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কর্মসূচী

সংশোধিত করা হয়। আবার ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যের দাবি, অন্ধ্রের শ্রীপত্তি রামালুর আত্মবিসর্জনের পর ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের দাবি সোচ্চার হয় গোর্খাদের মধ্যে। এর পরবর্তীতে জাতীয় সংহতি কমিটিতে সিপিএমের তদানীন্তন সাধারণ সম্পাদক পি. সুন্দরাইয়া যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তাতে জাতীয় সংহতির জন্য 'বিভেদপন্থী'দের বিরুদ্ধে লেখা হয়েছিল। সেই সময়েই সিপিএমের অন্যতম নেতা নীরেন ঘোষ বলেছিলেন— ''কমিউনিস্টদের জাতীয়-সংহতির জন্য চিন্তা করার দরকার নেই। সংহতি না করে কেন্দ্রকে অস্থির করার ব্যবস্থা করলেই তো কমিউনিস্টদের সুবিধা হবে।'' এই বক্তব্যের দরুন সিপিএমের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নীরেন ঘোষকে তীব্র সমালোচনা করেন।

আসলে জাতি এবং জাতীয়তা সম্পর্কে এদেশের কমিউনিস্টরা তাঁদের উপাস্য দেবতা স্তালিনের বক্তব্যকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করে। নিজের দেশের পরম্পরাকে এদেশের কমিউনিস্টরা বোঝার চেষ্টা করেনি। দেশের অনুন্নত জাতিসমূহের সমস্যাও বোঝার চেষ্টা করেনি, তারই ফসল দার্জিলিং সমস্যা। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার আসলে সিপিএম দার্জিলিং সমস্যার সমাধান করতে পারেনি না চায়নি। প্রথমদিকে দার্জিলিং-এর দায়িত্ব ছিল জ্যোতি বসুর উপরে। জ্যোতি বসু মাঝেমধ্যে রতনলাল ব্রাহ্মণকে দিয়েই কিছু নির্দেশ পাঠাতেন। দার্জিলিং-এর একদা অবিংসবাদী নেতা রতনলাল ব্রাহ্মণ দার্জিলিং ছেড়ে কলকাতায় সরকারি আবাসনে থাকতে লাগলেন। পাহাড়ে সিপিএম ভেঙে গেল। একদল সিপিএম কর্মী পাল্টা পার্টি করলেন। বস্তুত এরপর দার্জিলিঙের পাহাড়ি অঞ্চলে সিপিএম নিষিদ্ধ হয়ে গেল। পরবর্তীতে যখন বুদ্ধদেববাবু মুখ্যমন্ত্রী হয়ে দার্জিলিং-এর দায়িত্ব পেলেন, তখন তিনি তাঁর প্রিয়পাত্র অশোক ভট্টাচার্য-এর হাতে ক্ষমতার তামাক খেতে লাগলেন। মনে রাখতে হবে এই পরাজিত মন্ত্রীকে দার্জিলিং-এর মানুষজন 'অশোক আগরওয়াল' নামে অভিহিত করে। আর এই আগরওয়ালদের গোর্খারা 'ভাটিয়া' বলে থাকে। অশোকবাবুর ব্যবসায়ী-তোষণ নীতির ফলে সুবাস ঘিসিং এবং তাঁর দলের অভ্যুদয় ঘটলে সিপিএম কখনও ঘিসিংকে সমর্থন, কখনও বিরোধিতা করার সুবিধাবাদী নীতি অনুসরণ করে। ফলে দার্জিলিং-এর পাহাড়ি অঞ্চলের সমস্যা তথা গোর্খাল্যান্ড নামে পৃথক রাজ্যের দাবি পাহাড়ের মানুষদের মনে গেঁথে গেছে।

এই পটভূমিকায় মমতা ব্যানার্জি 'গোর্খাল্যান্ড-এর সমস্যা সমাধানের পথে' এগোলেন। এর জন্য ডি জি এইচ সি'র প্রশাসক অনিল ভার্মাকে দায়িত্ব দিলেন। ভার্মা একমাস ধরে দৈনিক চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে আলোচনা চালিয়ে চুক্তির খসড়া তৈরি করেন। ১২ তারিখ ত্রিদলীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিকভাবে ব্যর্থ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদম্বরম।

এই চুক্তির পরদিন একই মঞ্চে মোর্চা সভাপতি বিমল গুরুং এক সভা করেন এবং বলেন— তিনি ''পাহাড়-চুক্তি একটি উন্নয়নী প্যাকেজ মাত্র। মমতা ব্যানার্জি পৃথক গোর্খাল্যান্ডের যৌক্তিকতা মেনে নিয়েছেন। কেবলমাত্র রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার জন্য এই কথাটা বলতে পারছেন না। পৃথক গোর্খাল্যান্ড না-হওয়া পর্যন্ত আমরা থামবো না। তরাই এবং ডুয়ার্সের অতিরিক্ত অঞ্চল গোর্খাদের না দেওয়া পর্যন্ত গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নির্বাচন হতে দেবো না।' এর পরে সুবাস ঘিসিং-এর দলও মাথা তুলতে আরম্ভ করেছে। গ্রেটার কোচবিহারের দাবি উঠছে। সিপিএম এসব থেকে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে।

অধিবক্তা পরিষদের রাজ্য সম্মেলন তারাপীঠে

সংবাদদাতা : তারাপীঠ॥ অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের আপ্তবাক্য হলো— 'ন্যায় মম ধর্ম'। বছর তিনেক আগে অন্ধ্রপ্রদেশে স্যামুয়েল রাজশেখর রেড্ডির (কংগ্রেস) সরকার রাজ্যের খৃস্টানদের জেরুজালেম (যীশুখৃস্টের জন্মস্থান) তীর্থযাত্রার জন্য বাৎসরিক ১০০ কোটি টাকা অনুদান-এর সরকারি (জি ও) নির্দেশ দিয়েছিল। তখন রাজ্যের তপসিলী জাতি ও উপজাতি ছাত্ররা তাদের জন্য স্কলারশিপ আদায় করতে পথে নেমে আন্দোলন করছিল। পাশাপাশি অধিবক্তা পরিষদ করের টাকা ধর্মীয় কাজে প্রদানের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 'রিট পিটিশন' দাখিল করে। ফলে ওই সরকারি নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারি (স্টে-অর্ডার) হয়।

একইরকমভাবে ১৯৯২-এর বাবরি ধাঁচা মামলায় বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ

সম্মেলনে বক্তব্যরত ডি ভরত কুমার, রয়েছেন (বাঁ দিক থেকে) কিঞ্জল বড়াল, অমিয় রায়, (ডান দিকে) রমাপদ পাল, জয়দীপ রায় ও অজয় নন্দী।

আয়ার-এর নির্দেশ ছিল ওই বিশিষ্ট স্থান 'রামজন্মভূমি'। ''তাই রামজন্মভূমিকে সমর্থন সাম্প্রদায়িকতা বললে আমরা সাম্প্রদায়িক।'' উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ডি. ভরতকুমার।

গত ২৩-২৪ জুলাই বীরভূম জেলার তারাপীঠে অখিল ভারতীয় অধিবক্তা পরিষদ অনুমোদিত 'ন্যাশন্যালিস্ট লইয়ার্স ফোরাম' (পশ্চিমবঙ্গ শাখা)-এর বার্ষিক বৈঠক এবং রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিকেল চারটেয় ভারতমাতা ও তারামায়ের প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে সম্মেলনের সূচনা করেন কলকাতার নগর দায়রা আদালতের মাননীয় বিচারপতি প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশিষ্ট অতিথি সরকারী ব্যবহারজীবী পিনাকী গাঙ্গুলী তাঁর ভাষণে বলেন, দেশ ও সমাজের স্বার্থে তিনি কাজ করে যাবেন।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ দেন ফোরামের রাজ্য সভাপতি অমিয় রায়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক রমাপদ পালও আগত প্রতিনিধিদের সামনে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের বিভিন্ন সত্র পরিচালনা করেন অ্যাডভোকেট অজয় নন্দী। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করেন ও ধন্যবাদ জানান কিঞ্জল বড়াল। কয়েকটি জনস্বার্থ মামলায় ফোরামের জয়লাভের কথাও এদিন প্রতিনিধিদের সামনে তুলে ধরা হয়। ২৪ জুলাই সকালে বহু আলোচিত ''প্রিভেনশন অফ্ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভায়োলেন্স বিল ২০১১'' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন পূর্বাঞ্চল সম্পাদক অ্যাডভোকেট জয়দীপ রায়। ২৩ জুলাই সন্ধ্যায় সংস্কার ভারতী'র তারাপীঠ শাখা নৃত্য-গীত-আবৃত্তি পরিবেশন করেন।

রাজ্যের ১২টি জেলা থেকে ১৪ জন মহিলা সহ ১০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

এই সময়

সংস্কৃত দৈনিক

বিশ্বের একমাত্র সংস্কৃত দৈনিক 'সুধর্মা' সম্প্রতি ৪২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। সুধর্মা-র চলার পথ বেশ কঠিন। কেন্দ্র বা রাজ্য কোনও সরকারই পত্রিকাটি সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেনি। মহীশূর থেকে প্রকাশিত এবং কে ভি সম্পত কুমার সম্পাদিত দৈনিকটির প্রচার সংখ্যা ২০০০-এর বেশি।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, একটা 'মৃত ভাষা'য় পত্রিকা প্রকাশ করা কেন? সম্পাদকের স্ত্রী শ্রীমতী জয়লক্ষ্মী খুব স্পষ্টভাবেই এর উত্তর দিয়েছেন। ব্যক্তিগত ভাবে তিনি হিন্দী, তামিল, কানাডা, ইংরাজী এবং অবশ্যই সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ। তাঁর বক্তব্য, কে বলেছে সংস্কৃত ভাষা মৃত? প্রতিদিন সকালে এদেশের মানুষ সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করে, সংস্কৃত মন্ত্রে পূজা করে; এদেশে বিবাহ, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সব সংস্কারই হয় সংস্কৃতে। সংস্কৃত ভাষা ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে। এদেশের বহু ভাষারই জননী হচ্ছে সংস্কৃত। এখন ইনফরমেশন টেকনোলজির (আই টি)-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাও সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করছেন। সম্পত কুমার জানান, ১৯৭০ সালের ১৫ জুলাই তাঁর পিতা পণ্ডিত ভদ্ররাজ আয়েঙ্গার এই পত্রিকাটি শুরু করেন। তখন এর দাম ছিল মাত্র এক টাকা। বেদ, যোগ, ধর্ম, এমনকী রাজনীতির চর্চাও এই পত্রিকার বিষয়।

ডি আর ডি ও-তে যোগ

সম্প্রতি দি ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডি আর ডি ও) তাদের পাঠ্যসূচীতে যোগ-কে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কাইরাজস্তান (kyrgrystan)-এ উচ্চ পার্বত্য এলাকায় অসুখ ও তার চিকিৎসার জন্য একটি যৌথ গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিয়াচীন, সিকিমের নাথুলা ও অরুণাচল প্রদেশের উচ্চ পর্বতশীর্ষে যেসব ভারতীয় সেনা নিযুক্ত হন, তাদের চিকিৎসাই এই কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দেশ্য। ১.৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলারের একটি প্রকল্প কাইজারস্তানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর কার্ডিওলজি অ্যান্ড ইন্টারনাল মেডিসিন (এন সি সি আই এস)-এর যৌথ উদ্যোগে ডি আর ডি ও শুরু করেছে।

উচ্চ পার্বত্য এলাকায় যেখানে শ্বাসকষ্ট অনুভব হয়, সেখানে যোগের কার্যকারিতা আরও উন্নত করার লক্ষ্যেই ডি আর ডি ও-র এই প্রচেষ্টা।

শোক সংবাদ

গত ৪ জুলাই ভোরে রায়গঞ্জ মহকুমার সঙ্ঘচালক বিজয়কৃষ্ণ তালুকদারের পিতৃদেব অজিত তালুকদার সজ্ঞানে সাধনোচিত ধামে গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। স্ত্রীসহ তিন ছেলে, এক মেয়ে ও তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধকে রেখে গেলেন তিনি।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদ জেলার জিৎপুর শাখার স্বয়ংসেবক পুলক পাল গত ৬ জুলাই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪২ বৎসর। তিনি ছোটবেলা থেকেই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তাঁর এক পুত্র, এক কন্যা এবং স্ত্রী বর্তমান। উল্লেখ্য, কলকাতা দক্ষিণ বিভাগের বিভাগ প্রচারক আশীষ পাল-এর ছোট ভাই তিনি।

***

কলকাতা দক্ষিণ বিভাগের প্রচারক আশীষ পাল-এর কাকীমা (৬৬ বৎসর) বিজয়া পাল গত ১১ জুলাই তারিখে পরলোক গমন করেন। মৃতুকালে তাঁর দুই পুত্র ও দুই পুত্রবধূ এবং দুই নাতি বর্তমান।

সমৃদ্ধ ভারত ও সন্ন্যাসী-বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্রের ভাবনা-চিন্তা

সাধন কুমার পাল

'...আমার সুখের জন্য এটা চাই— ওটা চাই— না হলে চলে না— ছেলেপিলের ন্যায় সদা এই ভাবই পোষণ করি— কাজেই শান্তি পাই না। অনিত্যের মধ্যে যাহা নিত্য সেই দিকে মনের গতি ফিরাইতে চেষ্টা করি না। কর্তব্য সাধনে, পরের দুঃখ সাধ্যানুসারে বিমোচন ব্রতী হইয়া জীবন পথে অগ্রসর হও ইহাই প্রকৃত সুখ; জীবনে এমন দুই একটি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি। কৃপাময় ঈশ্বর অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পথ দেখাইয়াছেন। ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম।' না এগুলো কোনও ধর্মগ্রন্থ বা কোনও অধ্যাত্ম পুরুষের বাণী নয়। এই লাইন কটি সরাসরি তুলে দেওয়া হয়েছে সন্ন্যাসী বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্রের ডায়েরি'র পাতা থেকে। শুধুমাত্র ভাবনা দিয়ে বা পরামর্শ দিয়ে নয় দেশের কল্যাণের জন্য তার অনুভূত যাবতীয় সত্য ও তত্ত্বকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে উনি যে জীবন পথ তৈরি করেছিলেন তার তুলনা উনি নিজেই। পরাধীন ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রবর্তক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় যে প্রকৃত অর্থেই একজন আত্মভোলা ভোগবিলাসবিমুখ মানুষ ছিলেন তা বোঝার জন্য সে সময়ের একটা ঘটনায় চোখ রাখা যেতে পারে।

বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বই) থেকে এক বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি কলকাতায় ঘুরতে এসে ভাবলেন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে একবার স্বচক্ষে দেখে গেলে মন্দ হয় না। খোঁজ নিয়ে জানলেন ৯১, আপার সার্কুলার রোডে বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস-এর দোতলায় একটি ঘর ওঁর স্থায়ী ঠিকানা। বিশিষ্ট লোকেদের সঙ্গে দেখা করার নিয়মানুসারে কোম্পানির দারোয়ানের হাতে তাঁর পরিচয় জ্ঞাপক কার্ড ধরিয়ে দিতেই জানতে পারলেন এখানে সেসব ব্যাপার নেই। সরাসরি দোতলায় গেলেই ওঁর দেখা পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক দোতলার ওই নির্দিষ্ট ঘরটিতে গিয়ে দেখেন কোথায় সেই বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী। ছেঁড়া বইয়ের পাতা জুড়তে ব্যস্ত একজন দপ্তরি ছাড়া আর যে কেউ নেই সেখানে। নিরাশ হয়ে ফিরে এসে সেই দারোয়ানের কাছে জানতে পারলেন দপ্তরির মতো দেখতে লুঙ্গি গেঞ্জি পরা মানুষটিই আসলে রসায়নাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

জন্ম ১৮৬১ সালের ২ আগস্ট বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার বাড়ুলি গ্রামে। এই গ্রামেই পিতা হরিশ্চন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরেজি স্কুলে প্রফুল্লচন্দ্রের পড়াশুনা শুরু। ১৮৮৫ সালে ইংল্যান্ডের এডিনবরা থেকে বি.এ. ও ১৮৮৭ সালে ওখান থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি ডি. এস. সি লাভ করে দেশে ফিরে উচ্চপদে চাকুরি তো দূরের কথা একটি সাধারণ অধ্যাপনার কাজ তখনকার বৃটিশ সরকার তাঁকে দেয়নি। এক বছর অপেক্ষা করার পর প্রেসিডেন্সী কলেজে অস্থায়ীভাবে সহ অধ্যাপক পদে নিযুক্তি পেলেন।

এই কলেজে অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে নিজ হাতে গড়ে তোলা ল্যাবরেটরিতেই তিনি চালিয়ে ছিলেন রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষানিরীক্ষা। ১৮৯৬ সালে মারকিউরাস নাইট্রাইট তৈরি করে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে উপযুক্ত সুযোগ পেলে ভারতীয়রাও বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণায় সফল হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ যেমন চিকাগো ধর্মমহাসভায় ছুটে গিয়েছিলেন এদেশকে ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতে, ঠিক তেমনি বিশ্বের দরবারে বিশেষ করে ইউরোপের বিদ্বৎসমাজে ভারতবর্ষের জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাস তুলে ধরতে তিনি হিন্দুদের অর্থাৎ ভারতীয়দের রসায়নচর্চার ইতিহাস নিয়ে শুরু করলেন গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা।

এর ফলস্বরূপ ১৯০২ সালে প্রকাশিত হলো 'হিস্ট্রি অফ্ হিন্দু কেমেস্ট্রি'-র প্রথম খণ্ড। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পত্রপত্রিকায় দেখা গেল দেশবিদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। সে সময় ইংলন্ডে বিক্রিও হয়েছিল প্রচুর। এরপর ১৯০৯ সালে প্রকাশিত হলো বইটির দ্বিতীয় খণ্ড। এর ভূমিকায় প্রফুল্লচন্দ্র লিখলেন— 'হিন্দু জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে, রয়েছে বর্তমানের বিরাট সম্ভাবনা এবং উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও সে করতে পারে। যদি এই পুস্তকটি আমার দেশবাসীকে জগতের বিভিন্ন জাতির বুদ্ধিজীবী মহলে নিজেদের পুরাতন প্রাধান্য ফিরে পাবার কাজে উদ্দীপিত করতে পারে তবে আমি মনে

করব আমার পরিশ্রম বৃথা যায়নি।"

পরাধীন ভারতবর্ষে হাতেগোনা দুচারজন চিন্তানায়ক ছিলেন যাঁরা গভীর ভাবে বিশ্বাস করতেন বৃটিশ তাড়িয়ে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটালেই দেশের সমস্ত সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়। এই চিন্তাবিদদের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র অবশ্যই একজন। ঠিক এই কারণেই তিনি হয়তো আজীবন কংগ্রেসের সদস্য হয়েও প্রত্যক্ষভাবে দেশের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ না করে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একদিকে বৃহৎশিল্প গড়ে তোলা, অন্যদিকে গান্ধীজী প্রস্তাবিত চরকা প্রবর্তন করে ইংরেজের সীমাহীন শোষণের ফলে গ্রামপ্রধান ভারতের ভেঙ্গে পড়া অর্থনীতিকে পুনর্জীবিত করে শিল্পে বাণিজ্যে ভারতকে বৈভবশালী সম্পদশালী করে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এছাড়াও ১৯০৫ সালে দেশজোড়া বিদেশী দ্রব্য বয়কটের আন্দোলন দানা বাধলেও সমান্তরাল ভাবে স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদনের আন্দোলন গড়ে না ওঠার জন্য যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল এই বিষয়টি প্রফুল্লচন্দ্রের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল।

১৯৩১ সালে পুনাতে এক স্বদেশী মেলার উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ''...যখন মহাত্মাজী ১৯২১ সালে প্রথমে তাঁর নতুন আন্দোলনের প্রতীক হিসেবে চরকা আমদানী করলেন তখন যন্ত্র সভ্যতায় বিশ্বাসী আমি ওই মধ্যযুগের স্মৃতি হিন্দুকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা দেখে প্রচুর হেসেছিলাম। কিন্তু শীঘ্রই দুর্ভিক্ষ ও বন্যায় আক্রান্ত নিজের প্রদেশ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণের কাজে কর্তব্যতাড়িত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হলো। আর তখনই মনে হলো জমিতে যখন ফসল নেই তখন ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষের বিকল্প কাজ দেওয়া দরকার।" এছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন ভারতের মতো জনবহুল দেশে বৃহৎ শিল্প সমস্ত অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে না। সেজন্য এদেশে গ্রামীণ কুটির শিল্প প্রসারের প্রয়োজন আছে।

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ চরকা বা খাদি আন্দোলনকে তিনি গ্রহণ করলেও গান্ধীজির অনেক রাজনৈতিক কর্মসূচীকে তিনি গ্রহণ করেননি। যেমন অসহযোগ আন্দোলনের অঙ্গ হিসেবে ছাত্রছাত্রীদের স্কুল কলেজ ছেড়ে আসার যে আহ্বান গান্ধীজি রেখেছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র তার বিরোধী ছিলেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ভারসাম্যহীন রাজনৈতিক কর্মসূচীতেও তিনি বিশ্বাস করতেন না। গান্ধীজির খিলাফৎ আন্দোলনকে তিনি একেবারেই সমর্থন করেননি। আলিগড়ের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়ার কনভোকেশনের বক্তৃতায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন ''ইস্তাম্বুল থেকে যে খিলাফতের চাকা ঘুরছে ভারত কখনওই সেই চাকার স্পোক (spoke) হতে পারে না। আমাদের সকলেরই বাধ্যতামূলক লক্ষ্য হওয়া উচিত ভারতের স্বরাজ লাভ এবং অন্য সমস্ত কিছুকেই তার জায়গাতেই থাকতে দেওয়া উচিত।"

শিক্ষা সম্পর্কে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তব্য তুলে ধরলে মনে হবে এ যেন আজকের দিনের সর্বশিক্ষা অভিযানেরই স্লোগান। তিনি বলতেন— সর্বসাধারণের জন্য শিক্ষা চাই। শিক্ষা শুধুমাত্র পয়সাওয়ালাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এটা হতে পারে না। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলে সেখানে মোটা টাকা মাইনের বিনিময়ে ভাইসচ্যান্সেলররা রাজত্ব করবেন, কিন্তু গাঁটের কড়ি না ফেললে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জুটবে না এই ব্যবস্থা আমাদের দেশে দরকার নেই। ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতির জাঁকজমকে আমরা যেন শিক্ষার মূল ব্যাপারটি ভুলে না যাই। যুবকদের অকারণে শহরমুখী না করে গ্রামবাংলায় বিভিন্ন রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল বেশি।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ভক্ত হয়েও তিনি চাইতেন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা মাতৃভাষার মাধ্যমে হোক। এই সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন— ''ছাত্রদের জীবনের ছয় থেকে সাতটি অমূল্য বছর চলে যায় একটি বিদেশি ভাষা আয়ত্তের চেষ্টায়। উদ্দেশ্য কি, না ওই বিদেশি ভাষার মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞান লাভ। এই ধরনের বিকৃত চিন্তা কোনও দেশে আছে বলে মনে হয় না।"

প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনে আরেকটি এমন দিক ছিল যে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দেখে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। ফলে বন্যা দুর্ভিক্ষ যাই হোক না কেন তিনি সশরীরে ঝাঁপিয়ে পড়তেন ত্রাণের কাজে। এমন দৃষ্টান্তও আছে যে বিজ্ঞান কলেজের গবেষণা পড়াশুনা মুলতুবী রেখে তিনি সেবাব্রতী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বন্যাত্রাণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। হাত পেতে সাহায্য তুলেছেন আর্ত মানুষের জন্য।

প্রশ্ন হলো, কিংবদন্তীতুল্য একজন মানুষ যাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিল বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের হৃতগৌরবের পুনরুদ্ধার, তাঁকে আজ আমরা কোথায় রেখেছি। বাংলাদেশে তাঁর বাড়ির এক অংশ বাংলাদেশের পূর্ত মন্ত্রণালয় অধিগ্রহণ করলেও বাদবাকি অংশ অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি হিসেবেই রয়ে গেছে। এই অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি নামক কুখ্যাত আইনের আড়ালে শত্রুর ছাপ ভারতের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববরেণ্য এই বিজ্ঞানীর গায়েও সেঁটে দেওয়া হয়েছে। ১৯২৫ সালের ২৪ নভেম্বর ঢাকার বাংলা বাজারের কাছে প্রফুল্লচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ আজ পূর্ণাঙ্গ মেডিক্যাল কলেজের রূপ নিলেও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতিচিহ্নটুকু। কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত আচার্য দেবের সাধের বেঙ্গল কেমিক্যাল সরকার অধিগ্রহণ করলেও কারখানার যে অংশে ইথানল তৈরি হোত সেই অংশ আজ বেহাত হয়ে গেছে। যে প্রফুল্ল চন্দ্রের জীবনের সাধনার সিংহভাগ কেটেছে বিদেশিদের হাত থেকে এ দেশের অর্থব্যবস্থাকে মুক্ত করে দেশীয় শিল্প বাণিজ্যের প্রসার ঘটানো, তাঁর নামেই নয়াচরে প্রফুল্ল চন্দ্র পেট্রোশিল্প তালুক গড়ে কুখ্যাত বিদেশি সংস্থাকে ব্যবসার সুযোগ করে দিতে উদ্যোগী হয়েছে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার। অর্থাৎ যে মানুষটি বাঙালি বাঙালি করে নিজেকে উজাড় করেছিলেন সেই বাঙালির হাতেই আজ জুটছে তাঁর 'মরণোত্তর' হেনস্থা! বাঙালির গর্ব, বাঙালির অহংকার আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের প্রতি বর্তমান প্রজন্মের এই অস্বাভাবিক, আত্মঘাতী মূল্যায়ন বোধহয় আচার্য দেবেরই লেখা সেই বিখ্যাত লাইনটিকে আজ আবার প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। যাতে উনি বলেছিলেন, 'বাঙালি তুমি কি ধ্বংসসাগরে ঝাঁপ দিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছ?'

প্রফুল্লচন্দ্র যে ভারত গড়ার লক্ষ্যে নিজের প্রতিভাময় জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। অজস্র রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও শিক্ষায়, স্বনির্ভরতায়, শিল্পে কৃষিতে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কোনও দিকেই আজকের ভারত সেই ভারত নয়। এদেশকে এই দেশের নিজস্বতা অনুসারে গড়ে তোলার জন্য প্রফুল্ল চন্দ্রের মতো চিন্তাবিদদের সাধনালব্ধ নির্মাণশৈলী পরাধীনতার সময় থেকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের একমুখী আন্দোলনের ঝলকানিতে যেমন আলো আঁধারিতে থেকে গেছে, স্বাধীন ভারতে ক্ষমতা দখলের রাজনীতির কূটচালে সেই আঁধার যেন ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে। যদি কোনওদিন এদেশের মানুষ সেই আঁধার থেকে বেরিয়ে এসে রাজনৈতিক পরিবর্তন নিরপেক্ষ শক্তিশালী ভারত গড়ার তাগিদ অনুভব করে তাহলে সেদিন কিন্তু প্রফুল্ল চন্দ্রের ভাবনাগুলোকে সামনে আনতেই হবে। জন্ম সার্ধশতবর্ষে এই সন্ন্যাসী বিজ্ঞানীকে প্রণাম জানিয়ে আমরা আমজনতা সেদিনের অপেক্ষায় থাকলাম।

(আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্মদিবস উপলক্ষে প্রকাশিত)

আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রী বিজেপি'র উদ্যোগ

অতিথি কলম

চন্দন মিত্র

গত সপ্তাহে বিজেপি'র পক্ষ থেকে মনোনীত হয়ে আমি, রাজ্যসভায় আমাদের দলনেতা অরুণ জেটলী ও তৃতীয় সদস্য হিসেবে আমেরিকায় এক দশক ধরে কর্মরত, বর্তমানে কর্ণাটক থেকে প্রথমবারের লোকসভা সদস্য জনার্দন স্বামী একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলাম। আমার মনে হয় সম্ভবত এই প্রথম একটি দলীয় নির্বাচিত প্রতিনিধি দল আমেরিকার সর্বোচ্চ প্রশাসনের কর্তা, সেনেটর, কংগ্রেস প্রতিনিধি, বিদ্বজ্জন ও সেদেশের নীতি নির্ধারণ চর্চার মতো ব্যাপক একটি পরিসরে খোলামেলা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করল। ওয়াশিংটনে যে তিন দিন আমরা ছিলাম, তার মধ্যে শ্রীজেটলী বিশেষ সম্মানীয় 'হেরিটেজ ফাউণ্ডেশনে' বক্তব্য রাখার পাশাপাশি একই গুরুত্বের ব্রুকিং ইন্সটিটিউশনেও একটি গোলটেবিল বৈঠকে নেতৃত্ব দেন। আমার সৌভাগ্য, আমি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের অন্তর্গত ইন্ডিয়া ক্লাবে আমার বক্তব্য পেশ করতে পেরেছিলাম। মজার কথা, ওখানেই আমি দিল্লীর স্টিফেনস্ কলেজের বহু প্রাক্তনী ও দিল্লীর অন্য পরিচিতদের দেখা পাই। উভয় দেশের পক্ষেই চিন্তার কারণ আছে, এমন কিছু বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময় জরুরি— এমনটাই দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের পরিকল্পনায় আসাতেই আমাদের এই যাত্রা। বিশেষ করে একটি দায়িত্বশীল বিরোধী দল হিসেবে যারা আগামী ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতা দখলের দাবিদার। স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনা ছিল দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্রিক, যা আজ বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক স্থান বলেই কুখ্যাত হয়েছে। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ যে আমেরিকানদের সবিশেষ ভাবিয়ে তুলেছে, তা বেশ পরিষ্কার। সেজন্য ওরা এব্যাপারে আমাদের নীতি সম্বন্ধে জানতে আগ্রহ প্রকাশ করে। আমাদের সফরের সময়েই কাকতালীয়ভাবে প্রেসিডেন্ট ওবামা আফগানিস্তান থেকে আমেরিকান সৈন্যের ক্রম-অপসারণের ইচ্ছা ঘোষণা করেন, যার মধ্যে তেত্রিশ হাজার শুধু এবছরেই ফিরবে। এ প্রসঙ্গে আমরা আমেরিকার নীতি নির্ধারকদের আফগানিস্তান থেকে চটজলদি সৈন্য প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিপদ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করি। একই সঙ্গে জানাই সেখানকার কারজাই সরকার এখনও থিতু হয়নি এবং দেশের সর্বত্র তাঁর নিয়ন্ত্রণও সুদৃঢ় নয়। তালিবানরা বাস্তবিকভাবেই এখনও বিপদের কারণ। বিশেষ করে আফগানিস্তানের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশগুলিতে তাদের প্রভাব যথেষ্ট। ওসামা বিন লাদেনকে সরিয়ে দেওয়া গেলেও এই অঞ্চলের তালিবানরা যে কোনও মুহূর্তে জেহাদী হামলা চালানোর মতো ক্ষমতা রাখে।

> **আমেরিকান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তাদের এমন শাঁখের করাতের মতো অবস্থা যে অর্থনৈতিক ভাবে পাকিস্তানের ওপর চাপ দিলে, সাহায্য, অনুদান ইত্যাদি কমালে তা দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ডেকে এনে দুর্বল সরকারের টিকে থাকাকে আরও দুর্বল করবে। অপরপক্ষে এই সরকারকে ঢালাও অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিতে থাকলে তা অপাত্রে বিতরণের সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে।**

গড় পড়তা আমেরিকানদের ধারণা, আমেরিকার যুদ্ধ পরিকল্পনা পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে ক্ষিপ্র ও নিখুঁত আক্রমণে লাদেনকে নিকেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পুরোপুরি সফল হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তারা আর সামরিক উড়োজাহাজ থেকে কফিনবন্দী মৃত সৈনিকের দেহ না দেখে ঘরের ছেলেদের ঘরেই দেখতে চায়। এছাড়া আমেরিকার অর্থনীতিও ২০০৮ সালের ধস কাটিয়ে এখনও আশানুরূপ শক্তপোক্ত হয়নি। চাকরি-বাকরির বাজারে এখনও মন্দা। শিল্পের ক্ষেত্রেও সেরকম আশার আলো দেখা যাচ্ছে না। সর্বোপরি রপ্তানী বাণিজ্য বৃদ্ধিও যথেষ্ট নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিদেশে সামরিক বাহিনী মোতায়েন বা যুদ্ধ পরিস্থিতি চালানো, তা আফগানিস্তানেই হোক বা লিবিয়ায়, মোটেই জনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নয়। ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামা একটি অত্যন্ত কঠিন পুনর্নির্বাচনী লড়াইয়ের মোকাবিলা করতে চলেছেন। তাঁর জনপ্রিয়তার মাপকাঠির পারদ ওসামা বিন লাদেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ঊর্ধ্বগতি দেখালেও অর্থনৈতিক বিকাশের শম্বুকগতি সেটাকে চূড়ান্ত ভাবে নামিয়ে দিয়েছে।

তাই ওবামাসাহেবের কাজটা অনেকটাই দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার পর্যায়ে চলে গেছে। এক দিকে তাঁকে সমগ্র বিশ্বের নজরদারের ভূমিকায় থাকতে হবে, অন্যদিকে দেশের মধ্যে চাকরি তৈরি করতে হবে। এ কারণেই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এক ধরনের ঐক্যমত্য হলেও তা চালিয়ে যাওয়ার খরচা নিয়ে এখনও কোনও সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকান নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারটা খুবই গুরুত্ব পাচ্ছে। তারই ফলশ্রুতিতে কংগ্রেসের সদস্য ও সেনেটরেরা খোলাখুলি আমাদের মতামত জানতে চায় যে পাকিস্তানের সঙ্গ পরিহার করার পক্ষে কোনও বিকল্প রাস্তা কি আমরা আমেরিকানদের দিতে পারব? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রী জেটলী একটি প্রতিপ্রশ্ন করেন যে, পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা ভাল, তবে সেটি কোন পাকিস্তান? সেটি গণতন্ত্রী, আধুনিকতার পথে চলা পাকিস্তান, নাকি ইসলামিক, তালিবানী পাকিস্তান? এই পটভূমিতে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং আই এস আইয়ের ভূমিকাই বা কি হবে? যদিও আমেরিকা ও ভারত উভয়েই চায় গণতন্ত্রের পথে চলা এক সুস্থির ও সমৃদ্ধ পাকিস্তান। কিন্তু পরিতাপের বিষয়,

সে দেশের অনভিপ্রেত ঘটনাক্রমকে নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারিত করার কোনও পন্থাই উভয়ের কারুরই হাতে নেই। আমাদের দুই দেশেরই সমান চিন্তার বিষয়, এবং ইচ্ছা পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর কট্টরবাদী ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করি। সম্প্রতি করাচীর মেহরানের নৌঘাঁটিতে হামলায় এই কট্টরবাদিতা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা গেছে। এই আক্রমণ সরকারিভাবে প্রতিহত করা গেলেও এটা জলের মতো পরিষ্কার যে সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকেই মদত ছাড়া এমনটা ঘটে না। এই হামলা আরও প্রমাণ করে যে, জেহাদীরা সেনাবাহিনীর ভেতরেই বহু বছর ধরে নিজেদের সফল অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। ব্রুকিং ইন্সটিটিউশনে এটাই আলোচনার মুখ্য বিষয় ছিল। ওখানকার ডেপুটি ডাইরেক্টর ব্রুস রিডেল সম্প্রতি পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীতে এই কট্টরবাদী প্রভাবের ওপর এই প্রথম একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন।

আমেরিকান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তাদের এমন শাঁখের করাতের মতো অবস্থা যে অর্থনৈতিক ভাবে পাকিস্তানের ওপর চাপ দিলে, সাহায্য, অনুদান ইত্যাদি কমালে তা দেশের মধ্যে অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ডেকে এনে দুর্বল সরকারের টিকে থাকাকে আরও দুর্বল করবে। অপরপক্ষে এই সরকারকে ঢালাও অর্থ ও সামরিক সাহায্য দিতে থাকলে তা অপাত্রে বিতরণের সম্ভাবনাও থেকে যাচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের দ্বিচারিতা ও ছলনাময় ভূমিকা সম্বন্ধে আমেরিকা এখন একরকম নিশ্চিত। কেন না, আমরা যে সমস্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তাদের গরিষ্ঠাংশই বিশ্বাস করে যে, প্রয়াত ওসামা বিন লাদেনের অবস্থান ও গতিবিধির ব্যাপারে ইসলামাবাদ পূর্ণ অবহিত ছিল, কেবল ওয়াশিংটনের কাছ থেকে সাহায্য অব্যাহত রাখতে সে তথ্য তারা বেমালুম চেপে যায়। এর মধ্যে রিপাবলিকানরা আবার পাকিস্তানের ব্যাপারে তাদের ডেমোক্র্যাট বন্ধুদের থেকেও বেশি আক্রমণাত্মক ও কঠোর অবস্থানে বিশ্বাসী। তবে কট্টরবাদীরাও পাকিস্তানের সঙ্গে থাকা ছাড়া কোনও চারা খুঁজে পাচ্ছে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আগ্রাসনমুখী ভূমিকারও যে যথাযথ মূল্যায়ন হয়েছে এমনটাও আমার মনে হয়নি। কারাকোরাম থেকে বালুচিস্তানের 'গদর' পর্যন্ত রেল যোগাযোগ নির্মাণের বিষয়টিও অবস্থানগত ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। হরমুজ খাঁড়ি থেকে মাত্র ৫০০ নটিক্যাল মাইল দূরে একটি উষ্ণ বন্দর নির্মাণের চৈনিক পরিকল্পনার বিষয়টির দিকে আমি নির্দিষ্টভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। কেননা, এই হরমুজ খাঁড়ি থেকেই 'গাল্ফ অয়েলে'র গরিষ্ঠাংশ জাহাজবন্দী হয়।

চীনের ভারতবর্ষকে এই ভাবে ঘিরে ফেলাটা যে কবির ভাষায় মুক্তোর মালা পরানো নয়, তা কিন্তু অধিকাংশ সমরবিদদের ব্যাখ্যায় সঠিকভাবে আলোচিত হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে ভারত মহাসাগরও যে খুব তাড়াতাড়িই বৃহৎ শক্তিদের পারস্পরিক মহড়া নেওয়ার ক্ষেত্র হয়ে উঠবে আর ভারতের পক্ষে সেই সম্ভাব্য বিপজ্জনক পরিস্থিতিও অনেক বিশেষজ্ঞই যথাযথ উপলব্ধি করেননি। এই পটভূমিকাতেই ভারত ও চীন 'হর্ন অফ আফ্রিকা' থেকে জলপথে প্রতিযোগিতায় অধিকার করা তেলের খনিগুলি থেকে তেল নিয়ে আসার কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। আমেরিকান বিশেষজ্ঞরা জাপান, অস্ট্রেলিয়া, সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে আমাদের সু-সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে নতুন করে গুরুত্ব আরোপ করে যাতে আমরা চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সমকক্ষ হতে পারি।

সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবেচনায় আমরা আশা করেছিলাম, পারমাণবিক চুক্তির ব্যাপারে আমেরিকানরা হয়ত সোরগোল তুলবে। কিন্তু তার বদলে দু-একজন কেবলমাত্র শিক্ষাবিদের কৌতূহলে জানতে চায়, ঠাণ্ডা যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বিশ্বের দুটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও পারমাণবিক চুক্তির ক্ষেত্রে বিজেপি বিরোধী অবস্থান কেন নিয়েছিল? পারমাণবিক দায়বদ্ধতা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমেরিকান সরবরাহকারীরা যে অসুবিধাজনক অবস্থায় পড়েছে এ ব্যাপারেও আমেরিকা তাদের হতাশা গোপন করেনি। এই বাস্তব ভূমিকাতেই আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করেছিলাম আমেরিকানদের সঙ্গে শক্তিশালী চুক্তিতে সর্বদা আগ্রহী হলেও কোনও পরিস্থিতিতেই আপস করবে না।

এতসবের থেকে একটা জিনিস পরিষ্কার, আমেরিকানরা বিজেপিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রেখেছে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতিতে যথার্থই আন্তরিক। আমার ২০০৯ সালের এমনই একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে চীন ভ্রমণের সময় ঠিক এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে, বৃহৎ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি বিজেপিকে ভবিষ্যতের শাসকের ভূমিকায় ভাবছে। তাই ভারতবর্ষের রাজনীতির দ্বিদলীয় অনিবার্যতা এখন এক মান্য ও গৃহীত বাস্তবতা।

(লেখক 'পাইওনীয়ার' পত্রিকার সম্পাদক)

রক্তাক্ত মুম্বাই, যোগসূত্র কলকাতা

বাসুদেব পাল

জেহাদিদের সন্ত্রাসে রক্তাক্ত এদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী, গর্বের বলিউডনগরী মুম্বাই। অঝোরে রক্ত ঝরে চলেছে বছরের পর বছর। এটাই নাকি পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা আই এস আই এবং এর মূল পরিকল্পনাকার জিয়াউল হকের ছদ্মযুদ্ধ বা প্রক্সিওয়ার পলিসি। কিন্তু ভারতে যেখানেই সন্ত্রাসবাদী হানা, বিস্ফোরণ হোক না কেন, তার একটা 'তার' বা সূত্র কিন্তু জুড়ে থাকে পশ্চিমবঙ্গে, বিশেষত খোদ কলকাতার সঙ্গে। কলকাতার একটি দৈনিকে ক'বছর আগে প্রথম পাতায় লেখা হয়েছিল, 'বুদ্ধবাবুর মরুদ্যান কলকাতা বাংলাদেশ থেকে জঙ্গি-জেহাদিদের প্রবেশদ্বার'। গত ১৯ জুলাই দৈনিক 'বর্তমান' লিখেছে— ''বাংলাদেশের হুজি (হরকত -উল- জেহাদ-ই- ইসলাম) ও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন পরস্পরের পরিপূরক। তারা একজোট হয়ে কাজ করে। এই জোটের মিলনকেন্দ্র কলকাতা। বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে পড়া অনুপ্রবেশকারী এবং অন্যদিকে দেশের অভ্যন্তরে বড়শহরগুলিতে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের নেটওয়ার্ক দীর্ঘদিন ধরেই কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় গোপনে নীরবে যাবতীয় যোগাযোগ স্থাপনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ...গুজরাট ও উত্তরপ্রদেশে স্পেশাল টাস্ক ফোর্স তাদের হাতে ধরা পড়া জঙ্গিদের জেরা করে বারংবার কলকাতার যোগসূত্র পেয়েছে।''

১৩ জুলাই সন্ধ্যা ৬-৪৫-এ দক্ষিণ মুম্বাইয়ের জাভেরি বাজারে প্রথম বিস্ফোরণ, দ্বিতীয় বিস্ফোরণ মধ্য মুম্বাইয়ের দাদার স্টেশনের কাছাকাছি কবুতরখানাতে ঠিক ৬-৫৫ মিনিটে, তৃতীয় বিস্ফোরণ দক্ষিণ-মুম্বাইয়ের অপেরা হাউস এলাকায়।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাভেরি-তে এই নিয়ে তৃতীয়বার বিস্ফোরণ হলো। প্রথমবার জেহাদিরা আঘাত করেছিলো ১৯৯৩-এর আগস্টে। আবার ২০০৩-এর আগস্টে। জাভেরি বাজার দেশের বৃহত্তম সোনা-রূপো ও হীরের বাজার। আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ ১৫০ বিলিয়ন কোটি টাকার বেশি বলে অভিমত সন্ত্রাস বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অজয় সাহানের। যা ভারতের মোট লেনদেনের সত্তর শতাংশ। এটা অবশ্য হোলসেল মার্কেটের কথা।

১২ মার্চ ১৯৯৩-তে মুম্বাইয়ে বিস্ফোরণ ছিল সবচেয়ে ভয়াবহ। নিহত ২৫৭ জন এবং আহত ৭১৩ জন। এরপর মুম্বাইয়ে ১৩ বার বিস্ফোরণ হয়েছে।

ভারতের নিরাপত্তা এবং তদন্ত সংস্থাগুলো ১৩ জুলাইয়ের বিস্ফোরণের জন্য নির্দিষ্ট করে কাউকে বা কোনও সংগঠনকে দায়ী না করলেও সকল সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। পূর্বাপর ঘটনাবলী এবং সাম্প্রতিক সন্ত্রাসী কাজকর্মের গতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যাচ্ছে যে এইসব জেহাদিদেরকে পাকিস্তানই মদত দিচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন (আই এম)-কেই বেশী করে সন্দেহ করা হয়েছে। 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' কিন্তু সিমি (স্টুডেন্ট- ইসলামিক মুভমেন্ট অফ্ ইন্ডিয়া)-রই এক শাখা। তবে এখন লস্কর এ তৈবা এবং হুজি-ও সন্দেহের তালিকায়। একটুর জন্য হাত ফস্কে গেল সন্দেহভাজন মুজাহিদিন ক্যাডার ফৈয়াজ উসমানি। পুলিশী জেরার মুখে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়েছে। ফৈয়াজ-এর ভাই আফজল উসমানি ২০০৮- এর গুজরাট-এর আমেদাবাদ বিস্ফোরণে জড়িত সন্দেহে ধৃত, জেলে আছে। সেও ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের সদস্য। মুম্বাইয়ে লাগাতার সন্ত্রাসবাদী হামলার মুখে রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের যে কচকচি মুখে মুখে উঠে এসেছে সেটা দুর্ভাগ্যজনক। কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক, যুব নেতা রাহুল গান্ধীর বক্তব্য— এসময়ে একশভাগ সন্ত্রাসী হামলা আটকানো সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ বলেছেন, কোনওরকম গোয়েন্দা ব্যর্থতার ঘটনা ঘটেনি। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, গোয়েন্দা বিভাগ যদি সফল তাহলে ঘটনা ঘটল কি করে? এমনকী ঘটনা ঘটে যাওয়ার দশদিন পরেও হাতড়ে বেড়ানো চলছে।

রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যগুলো কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে মিলছে না। ২০০৮- এর ২৬ অক্টোবর থেকে মুম্বাইকে সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারাটা নিঃসন্দেহে ব্যর্থতা। এছাড়া আর কীই বা বলা যেতে পারে? ২৬/১১ সন্ত্রাসী হামলার শিকার ১৬৬ জন মৃত এবং ৩০০ জন আহত। স্মরণ করা যেতে পারে ওই সময় প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং-এর বক্তব্য— 'জঘন্য আক্রমণ...আর পুনরাবৃত্তি হবে না (ghastly act...would not happen again)।

বাস্তব অবস্থা হলো, ভারতের সন্ত্রাসবাদ বা জিহাদী সন্ত্রাসকে মোকাবিলা করার ক্ষমতা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। একটা সময় শুধুমাত্র কাশ্মীর উপত্যকায় জেহাদী সন্ত্রাস সীমাবদ্ধ ছিল। সীমাহীন তোষণনীতি ও ভোটব্যাঙ্ক পলিটিক্সের ফলে আজ তা ভারতের সর্বত্র ডালপালা বিস্তার করে ছড়িয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, কোথাও বাদ নেই। ২৬/১১ মুম্বাই হামলার পর অঢেল অর্থ ব্যয় হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসকে মোকাবিলা বা কাউন্টার করার সক্ষমতা অর্জিত হয়নি। ১৩ জুলাই-এর হামলাই তার প্রমাণ। অর্থের অপচয় হয়েছে। খুব বেশি হলে, কোথাও কোথাও ছোটো ছোটো পকেটে কিছু কাজ হলেও হতে পারে। তবে, সব রাজধানী শহরে 'এন এস জি হাব' (ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড সেন্টার) গড়া বা এন আই এ (ন্যাশন্যাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি)-র কার্যকারিতা বিশেষ কিছু হয়নি। তা কেবলই নমুনামাত্র। সবই সাদা হাতী পোষার নামান্তর। প্রায় তিনবছর হতে চলল। কিন্তু 'ন্যাশনাল কাউন্টার টেররিজম্ সেন্টার' শুধু কাগজ-কলম বা আলোচনাতেই রয়েছে। ইতিমধ্যে প্রস্তাব, প্রাথমিক মৌলিক পলিসি এবং গোয়েন্দা তথ্য একত্রিত করার কাজেও সামান্যই অগ্রগতি হয়েছে মাত্র। প্রধানমন্ত্রী মনমোহনজীর পর্যবেক্ষণ প্রায় পাঁচবছর হতে চলল। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা 'কাউন্টারে টেররিজম্' ব্যবস্থা দাঁড় করাতে পারব ততদিন ভবিষ্যতে সন্ত্রাসী হানার বিষয়ে পূর্বানুমান ও মোকাবিলা সম্ভব নয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার পথে বিশেষ কাজ হয়নি। তা সে মুম্বাই বা অন্য যে কোনও স্থানেই হোক না কেন। আর দেরী না করে দিল্লীতে কেন্দ্রীকৃত ও কেন্দ্র থেকে সঞ্চালনকারী কাউন্টার টেররিজম্-এর যাবতীয় ব্যবস্থা এবং টেররিজম কাউন্টার করার জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাব্যবস্থা গড়ে তোলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

২৬/১১ মুম্বাই হানার পর রাজ্যস্তরে সন্ত্রাসী হামলা মোকাবিলার জন্য রাজ্য পুলিশবাহিনীকে বিশেষভাবে সংস্কার বা গড়ে তোলার কাজ হয়নি। যা হয়েছে তা নমুনামাত্র (Symbolic)। এলিট ফোর্স গড়ে তোলা, সশস্ত্র গাড়ী রাস্তার মোড়ে মোতায়েন হচ্ছে না। পুলিশবাহিনীতে দুর্লক্ষ্য হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণও খুবই সাধারণ স্তরের। একাত্ম গোয়েন্দা ব্যবস্থার 'চেইন্ সিস্টেম' প্রয়োজন।

জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশ সংখ্যা বৃদ্ধি দেশ জুড়ে খুবই ক্ষীণ। ২০০৮- এর শেষে প্রতি এক লক্ষ নাগরিকের জন্য ১২৮ জন পুলিশ ছিল। ২০০৯-এর অর্থাৎ মুম্বাই-এ হামলার এক বছর বাদে তা ১২৮ থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩৩ জন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের দাবী এই সংখ্যাটা বাড়িয়ে ১৬০ হবে। কিন্তু ওখানেও কারচুপি আছে। দি ব্যুরো অফ্ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপ্‌মেন্ট (BPR & D) দাবী করেছিল যে, ভারতে (২০০৮) এক লক্ষ মানুষ প্রতি পুলিশের সংখ্যা ১৭৮ জন। কিন্তু, ন্যাশন্যাল ক্রাইম রেকর্ডস্ ব্যুরো (NCRB) ২০০৯-এ ২০০৮-এর রিপোর্ট প্রকাশ করেছিল। যা অধিকৃত তথ্য। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ২০০১-এর জনগণনা অনুযায়ী মহারাষ্ট্রে জনসংখ্যা ও পুলিশের অনুপাত ছিল এক লক্ষ জনগণের জন্য ১৬০ জন পুলিশ। ২০১১-এর জনগণনাতে বিগত এক দশকে কুড়ি শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মহারাষ্ট্রে জনতা-পুলিশ অনুপাত ২০০৮-এ লক্ষ লোকের জন্য ১৫৫ থেকে ২০০৯-এর শেষে ১৬৬ জন হয়েছে। এটাও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম, যে রাজ্যে নিরাপত্তার প্রতি বিরাট চ্যালেঞ্জ রয়েছে সেখানে ব্যবস্থা ও নেতৃত্বের মধ্যে ঘাটতি আছে। ইনস্পেক্টর স্তরে ঘাটতি রয়েছে ২০.৩৯ শতাংশ— সাব-ইনস্পেক্টর, অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর সহ।

সংগঠিত অপরাধ (Organised Crime) দমনে অনেক ক্ষেত্রেই বাধা দেওয়া হয়। পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া যেতে পারে ২০১১-এর ফেব্রুয়ারিতে মহারাষ্ট্র পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত মহানির্দেশ ডি শিবনন্দন-এর বিস্ফোরক মন্তব্য— মালেগাঁওয়ে অ্যাডিশনাল কালেক্টর যশবন্ত সোনওয়ানের প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ডের পর তেল মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ছিল শুধুমাত্র সংবাদমাধ্যমের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যই।

১৯৯৩-এর বিস্ফোরণে ডোরা কমিটির তদন্ত রিপোর্টে একথাই প্রমাণিত হয়। ভারতবর্ষে বিরাট সংখ্যক অপরাধের ক্ষেত্রে রাজনীতিবিদ-আমলাতন্ত্র এবং ক্রিমিন্যালদের অশুভ আঁতাত একটি বড় ভূমিকা পালন করে। আশ্চর্যজনক হলো, ১৯৯৩-এর বিস্ফোরণের জন্য দায়ী দাউদ ইব্রাহিমের দলবল দিনদিন মুম্বাইয়ে শক্তিশালী 'ক্রাইম ফ্রানচাইজি' হিসেবে ডানা মেলছে দু'দশক বাদেও। দাউদ ইব্রাহিমের নেটওয়ার্ক পাকিস্তানের আই এস আই-এর পৃষ্ঠপোষকতায় সেদেশে সক্রিয় শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অফিসিয়াল তথ্য অনুসারে ভারতের যে সাতটি রাজ্যে পুলিশের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কিছু কাজ হয়েছে তাদের মধ্যে মহারাষ্ট্রও আছে। মহারাষ্ট্র এই বাবদ (আধুনিকীকরণ) কেন্দ্র থেকে যে অর্থ পেয়েছে তা খরচ করতে পারেনি, পারেনি হিসেব দাখিল করতেও। ফলে মহারাষ্ট্রকে অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হয়নি, তহবিল অন্যত্র চলে গিয়েছে। সর্বাধুনিক অস্ত্র নেই, থাকলেও ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষণ নেই। কমতি আছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, যানবাহন ও ফরেন্সিক যোগ্যতারও। অবশ্যই রয়েছে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে লাগাতার অপ্রতুলতা। ১৩ জুলাই আক্রমণের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিদাম্বরম্ যুক্তি দিয়েছেন, ''ওই বিশেষ গোষ্ঠীটি (যারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে) যোগাযোগের জন্য মেল বা ফোন ব্যবহার করে না।'' এটা ঘটনা যে, রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলোও (নিরাপত্তা) তাদের কার্যকলাপ বিষয়ে কিছুই জানতে পারেনি। ঐতিহাসিকভাবে ভারত তার মানব-মেধার উৎকর্ষতার জন্য (human intelligance (HUMINT) capabilities) গর্ববোধ করতে পারে। বিগত কয়েক বছরে টেকনিক্যাল ইনটেলিজেন্স-এ নজর দেওয়া হয়েছে বেশি করে। হিউম্যান ইন্টেলিজেন্স-তে নজর কম, দুর্লক্ষ্য করা হয়েছে। এই অবস্থাটা গ্রহণীয় নয়, বুঝতেও অসুবিধা হয়। কার্যকরী দক্ষ গোয়েন্দা ব্যবস্থা দেশব্যাপী সর্বস্তরে গড়ে তোলা দরকার। যাতে আগত ও অনাগত সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যায়।

'ইন্ডিয়া টু ডে' পত্রিকায় প্রকাশিত অভিনেতা অনুপম খেরের বক্তব্য দিয়ে লেখাটা শেষ করব। শ্রী খের বহুমুখী অভিনয়প্রতিভার অধিকারী। 'এ ওয়েডনেস ডে' ছবিতে তিনি এক শীর্ষ পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, অভিনয় করেছেন 'লমহ-এ' ছবিতে কাশ্মীরী জঙ্গি নেতার চরিত্রেও। তিনি বলেছেন— ''এধরনের আক্রমণ ভারতের যে কোনও স্থানেই হতে পারে। কিন্তু মুম্বাইকেই নিশানা করার কারণ মুম্বাই দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী। সহজেই অনেক বেশি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অতীতে আক্রমণকারীদের শাস্তি দিতে ব্যর্থতা দেখা গেছে। যা হীনমন্যতার উদ্রেক করে। একজন সাধারণ মানুষ কি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে? এর দায়িত্ব প্রশাসনের। যেভাবে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে মোকাবিলা করা হচ্ছে তাও হতাশাজনক (Frustrating)। আজমল কাসভ অভিযোগ প্রমাণের পরও বহাল তবিয়তে জেলে রয়েছে। আফজল গুরুকে এখনও কোনও সাজা দেওয়া হয়নি। এর ফলে দেশের মানুষের কাছে কি বার্তা পৌঁছাচ্ছে? আর কতদিনে আমরা রাজনীতিতে সংশোধিত হ'ব?''

উল্লেখ্য, গত ১৩ জুলাই জেলে বন্দী ২৬/১১ হামলার জীবিত আক্রমণকারী আজমল আমীর কাসভের জন্মদিন ছিল। অতীতে কাশ্মীরী সন্ত্রাসবাদী ফাঁসিতে মৃত মকবুল ভাটের জন্মদিন কাশ্মীর উপত্যকায় কিভাবে পালন করা হয় তা জানা আছে। এরপরও কি সাবধানতা অবলম্বন করা হবে? জানি না আরও কত ২৬/১১ বা ১৩/৭ নিরীহ জনগণের জন্য অপেক্ষা করছে? নিজের দেশে, নিজের ঘরে, ভারতবাসী আক্রান্ত। আর নেতারা ঠাণ্ডা ঘরে ঠাণ্ডা মেসিন লাগানো গাড়ীতে কম্যান্ডো পরিবেষ্টিত হয়ে জনসেবা করে বেড়াচ্ছেন। যাদের জনতাকে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা তারা তাদেরও দলের নেতা নেত্রীদের, তাদের পরিবারের লোকজনদের নিরাপত্তা বিষয়ে যতটা সচেতন তার বিন্দুমাত্র দেশের স্টুপিড কমনম্যানদের জন্য নন। সাধারণ মানুষ স্টুপিড এজন্যই যে, এই জনতার ভোটেই ওরা সরকারে যান। তাজ হোটেলে পাকজঙ্গিরা ঘাঁটি গাড়লেও মালিকদের বা ব্যবসার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। উল্টে সরকার নিরাপত্তা বাড়ায়। বিরোধী মতাদর্শের দলের মিছিল মিটিং-এ গেলেই অপরপক্ষের হাড়হিম করা অত্যাচার নেমে আসে। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে দেশের অভ্যন্তরীণ ও সীমান্তে নিরাপত্তার কথা ভাবুন। অনেক হয়েছে। আর নয়।

দেশজুড়ে সন্ত্রাসের লক্ষ্য কি কাশ্মীর?

ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

সম্প্রতি পাকিস্তানের এক ধর্মগুরু হুঙ্কার দিয়েছে— ভারত যদি কাশ্মীর ছেড়ে না আসে, তাহলে ভারতকে অবিলম্বে আক্রমণ করা হবে। অবশ্য ঘোষণাটা রাষ্ট্রের তরফ থেকে করা হয়নি, সুতরাং রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য এটা নয়। তবে সঙ্গত এই ঘোষণার পর সন্ত্রাসবাদ আরও বাড়বে— এখানে- ওখানে ঘটবে বিস্ফোরণ। ভীতির রূপ নিয়ে আসবে অফুরন্ত মানববোমা। অকালে ঝরবে আরও কিছু প্রাণ। মুম্বাইয়ের ১৩/৭-তে হয়েও তাই।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—ভারতকে কাশ্মীর ছেড়ে আসতে হবে কেন? কাশ্মীর কি পাকিস্তানের নাকি সন্ত্রাসবাদীদের, নাকি নিছক কাশ্মীরী মুসলমানদের? ভারত আক্রান্ত হয়েছে ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে। আবার ঘটবে সেই যুদ্ধ, নাকি চলবে সন্ত্রাসবাদী হামলা?

আমরা আগে বহুবার লিখেছি— কাশ্মীর ভারতের দখলীকৃত রাজ্য নয়— ১৯৪৭ সালে একটা বৈধ চুক্তি ও স্বীকৃত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্ত হয়েছে। ভারত ছাড়ার আগে বৃটিশ-সরকার দেশীয় রাজ্যগুলোকে (সংখ্যায় ছিল ৫৬২) ভারত বা পাকিস্তানের মধ্যে যে-কোনও একটা ডোমিনিয়ানের অন্তর্গত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল। কাশ্মীর মুসলমান-প্রধান হলেও হিন্দু-রাজা হরি সিং 'ইন্সট্রুমেন্ট অফ্ অ্যাক্সেসন্'-এ স্বাক্ষর দিয়ে কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। প্রথমে তিনি স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখতে চাইলেও ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর পাক্-বাহিনীর সঙ্গে আফ্রনীশী, ওয়াজিরি, মাসুদ প্রমুখ উপজাতি একত্রিত হয়ে কাশ্মীর দখলের চেষ্টা করে।

সেই পরিস্থিতিতে হরি সিং তাঁর প্রধানমন্ত্রী মেহেরচাঁদ মহাজনের মাধ্যমে ভারতের সাহায্য চান এবং পূর্বোক্ত দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে তাঁর কাশ্মীরকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করেন (ডঃ বিদ্যাধর মহাজন— দ্য কনস্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ৩৪৩)। রাজা হরি সিংয়ের আবেদনের একটা অংশে ছিল— 'With the conditions obtaining at present in my state and the great emergency of the situation as it exists, I have no option but to ask to half from the Indian Dominion. Naturally they cannot send the half ashed for by me without my state acceding to the Dominion of India. I have accordingly decided to do so and I attach the Instrument of Accession for acceptance by your Government'—(উদ্ধৃত, স্বদেশ সিং---কাশ্মীর, পৃঃ ৬৭)। ভারতের তৎকালীন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে লিখিত এই চিঠিই (২৬ অক্টোবর, ১৯৪৭) প্রমাণ করে যে, কাশ্মীরের ভারতভুক্তি একটা সম্পূর্ণ বৈধ ব্যাপার। পাকিস্তানের এই ব্যাপারে কোনও দাবিই থাকতে পারে না। আর সেই 'ইন্সট্রুমেন্ট' রাজা বা নবাবদেরই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার দিয়েছিল, প্রজাদের মতামত নেওয়ার ব্যাপার ছিল না।

কাশ্মীরের এই ভারতভুক্তি ভিন্ন ধরণের কিছু ছিল না— অন্যান্য দেশীয় রাজ্যগুলো সেখানে এই যুক্তরাষ্ট্রে এসেছে, কাশ্মীরের অংশগ্রহণও সেই একই চুক্তিপত্রের ফসল—'Was in the same form as was executed by the rulers

to the other states which acceded to India'— (দুর্গাদাস বসু—ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অফ ইন্ডিয়া, পৃঃ ২২৯)। এরপর ১৯৫১ সালে ভারতীয় সংবিধান অনুসারেই তার গণপরিষদ গঠিত হয়েছে, নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার ক্ষমতায় বসেছে এবং এত বছর ধরে রাজ্য-সরকার প্রদেশটা চালাচ্ছে। তার বাজেটের ৭৪ শতাংশ দেয় কেন্দ্রীয় সরকারই। আর এই রাজ্যকে রক্ষা করতে গিয়ে আমাদের

নিরাপত্তা-রক্ষীদের মধ্যে ৫৯৭৩ জন প্রাণ দিয়েছেন শুধু ১৯৮৮ থেকে ২০১০ সালের মধ্যেই।

এর পরেও কাশ্মীর থেকে ভারতকে সরে আসতে হবে কিছু সন্ত্রাসবাদীর হুমকির ফলে? তাহলে অন্য ৫৬১টা পূর্বতন রাজ্যের বর্তমান অধিবাসীরাও যদি স্বাধীনতা চান?

কিন্তু কাশ্মীরের জন্যই পুরোদস্তুর যুদ্ধ না হোক—সন্ত্রাস, হানাদারি ও অন্তর্ঘাত বাড়বে আরও। আরও রক্তাক্ত হবে দেশের মাটি, অশ্রুসিক্ত হবে বহু আত্মীয়-স্বজনের চোখ।

কিছু ভুঁইফোঁড় নেতা (যেমন রাহুল গান্ধী) এবং প্রাবন্ধিক (যেমন আবুর রাউফ--- 'সকালবেলা', ৯.২.১১) জানিয়েছেন, মুসলীম সাম্প্রদায়িকতার পাশাপাশি হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাও সমান বিপদের সৃষ্টি করেছে। কারও কারও বক্তব্য হলো— এই ধরনের উগ্র হিন্দুরা যদি ক্ষমতা দখল করে, তখন পারমাণবিক আক্রমণও ঘটতে পারে পাকিস্তানের ওপর।

কিন্তু স্পষ্ট করেই বলি— হিন্দু চেতনাটা এসেছে দীর্ঘকালের ইসলামী মৌলবাদের আগ্রাসন ও আমাদের ভীরু ও মেকি ধর্মনিরপেক্ষ নেতা- শাসকদের অকর্মণ্যতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে। আরও বড় কথা হলো— এই হিন্দুত্ব চেতনাকে একেবারেই মুস্‌লীম মৌলবাদ ও সন্ত্রাস-নীতির কাছাকাছি রাখা চলে না। বিজেপি ও তার সঙ্গীদের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বলা হয়ে থাকে— কিন্তু তারা তিনবার কেন্দ্রে ক্ষমতায় বসেছিল, কয়েকটা রাজ্যে এখনও তারা শাসন চালাচ্ছে— কিন্তু মুসলমান নিধনও হয়নি, এই সম্প্রদায়ের কাউকে বিতাড়িত করা হয়নি, ভারত হিন্দু-রাষ্ট্রও হয়ে যায়নি। গুজরাট- দাঙ্গার ব্যাপারে বহু নিন্দিত নরেন্দ্র মোদীকেও 'এফ আই টি', 'ক্লীন্‌চিট্' দিয়েছে। এই সব সংস্থা শুধু চেয়েছে— ভারতের সবাই ভারতবোধে উদ্দীপ্ত হন,—ধর্ম যা-ই হোক, একটা অখণ্ড জাতীয় চেতনা সবাইকে প্রাণিত করুক। বাজপেয়ী সরকারও পাকিস্তানে বোমা ফেলেননি।

এর সঙ্গে 'প্যান্ ইস্‌লামিক' অন্ধত্বের তুলনা আসে কখনও। দুটো একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার।

সুখের কথা--- সম্প্রতি কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবীর এই ধরনের মত ব্যক্ত করেছেন। নজরুল আমেদ জমাদার লিখেছেন—('মুসলিম সন্ত্রাসবাদই মুসলমানদের শত্রু', সকালবেলা, পৃঃ ২-১১), কিছু উগ্রপন্থীর জন্যই সমগ্র সম্প্রদায়টা এখনও সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে। তিনি যথার্থই মন্তব্য করেছেন— হিন্দু বা মুসলমানদের সবাই খারাপ নন, অধিকাংশ মানুষই সুখে-শান্তিতে বাস করতে চান।

কিন্তু ইস্‌লামের 'জেহাদ', কিছু মাদ্রাসা ও ধর্মগুরু এবং নেতার কুশিক্ষা ঘরে-ঘরে বন্দুকবাজ তৈরি করছে, সৃষ্টি হচ্ছে অরাজকতা। অনেকের ধারণা বিশ্বজুড়ে ইস্‌লাম কায়েম করতেই হবে, অন্য ধর্মমতাবলম্বীরা 'কাফের'। এই হিংস্রতা ও অন্ধত্বই সন্ত্রাসবাদের জন্ম নিয়েছে।

শুধু এই দেশে নয়—আমেরিকা, বৃটেন ও অন্যান্য বহু দেশে এই সন্ত্রাসবাদ সেখানকার নিরীহ ও সুভদ্র মুসলমানদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছে, সন্দেহের তীর থাকছে গোটা সম্প্রদায়টার দিকে।

তাঁর মতে, তাঁদের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে আধুনিক ও ধর্মনিরপেক্ষ করতে হবে। মুক্ত হতে হবে রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের হাত থেকেও।

সন্ত্রাসবাদী হানায় বিধ্বস্ত মুম্বাইয়ের হীরা শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অপেরা হাউস ও তৎসংলগ্ন জাভেরী বাজার এলাকায় বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রত্যক্ষ ক্ষতির মুখে পড়েছে মুম্বাইয়ের অর্থনীতি। বিশেষ করে মুম্বাইয়ের অপেরা হাউসের যেখানে খ্যাতিই রয়েছে বিশ্বের অন্যতম দামী পাথরের ভাণ্ডার হিসেবে। সেইসঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানীর হীরে-শিল্পে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ২৫ কোটি টাকার মতো বলে হীরে-ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন। মুম্বাই পুলিশের একটা সূত্রের দাবি সন্ত্রাসবাদীরা জেনেশুনেই তাদের কাজে হীরে-শিল্পকে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করছে। বিস্ফোরণের অকুস্থল পর্যবেক্ষণ করে পুলিশের তদন্ত রিপোর্ট বলছে, অপেরা হাউসের জনৈক হীরে-ব্যবসায়ীর সঙ্গে ১৩/০৭ বিস্ফোরণের মূল পাণ্ডা ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিদের যথেষ্ট যোগসাজশ ছিল।

প্রসঙ্গত, বিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই হীরে-শিল্পের ক্ষয়ক্ষতির হিসেব করতে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে একটা দল গঠন করা হয়েছিল। সেই দলের সঙ্গে উদ্ধারকারী কর্মীরা এবং পুলিশ অপেরা হাউসের পার্শ্ববর্তী রাস্তা থেকে ৬৫ খণ্ড হীরের টুকরো উদ্ধার করে। মুম্বাই ডায়মন্ড মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি-সদস্য জয়েশ লব্ধি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ''আমরা উদ্ধার হওয়া হীরেগুলোর মূল্য সঠিকভাবে নির্ধারিত করে উঠতে পারিনি। কিন্তু ঠিক করা হয়েছে যে সেগুলোর নিলাম হবে এবং বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্তদের পরিবারবর্গকে নিলামের লভ্যাংশ থেকে সাহায্য করা হবে।'' হীরে-ব্যবসায়ীরা এই উদারতাটুকু দেখানোর পাশাপাশি সরকারের কাছে উপযুক্ত নিরাপত্তাও দাবি করেছেন। উপযুক্ত নিরাপত্তা না পেলে মুম্বাইয়ের প্রতিবেশি রাষ্ট্র গুজরাতে তাদের ব্যবসা নিয়ে যাওয়ার জন্য যে নরেন্দ্র মোদীর স্বতঃস্ফূর্ত আহ্বান হীরে- ব্যবসায়ীদের সঙ্গেই আছে একথাও জানাতে ভোলেননি তাঁরা।

এদিকে এখনও অবধি পাওয়া পুলিশি তদন্তে উঠে এসেছে যে সন্দেহভাজন ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিটি মুম্বাইয়ের পশ্চিম শহরতলী থেকে ১৩ তারিখের ঠিক আগে বেশ কয়েকবার অপেরা হাউসের জনৈক হীরে- ব্যবসায়ীকে ফোন করে। কল-রেকর্ড ঘেঁটে গোয়েন্দারা দেখেছেন ঘটনার দিন দাদার থেকে অপেরা হাউসে সন্দেহভাজন জঙ্গিটির গতিবিধি লক্ষ্য করা যায়। গোয়েন্দারা এও দেখেছেন অপেরা হাউসের ওই হীরে- ব্যবসায়ীটির অ্যাকাউন্টে ওইদিনই জমা পড়েছে ২৭ লক্ষ টাকা।

অপেরা হাউসে ক্ষতিগ্রস্ত হীরে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশ কর্মীরা।

এটি ১৩/০৭-এর বিস্ফোরণ ঘটাতে সহায়তা করার জন্য ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া 'উপহার' কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, জয়পুর থেকে মুম্বাইতে টাকা ট্রান্সফার করার সময়ই 'হাওলা চ্যানেল' ব্যবহার করায় ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের ফাঁদে পা দেয় ব্যবসায়ীটি। আর এভাবেই জঙ্গিরা মুম্বাইয়ের হীরে ব্যবসার জগতে পা দেয়।

এসব কিছুর জন্যই রাজ্য পুলিশ-প্রশাসনকে দায়ী করছে ডায়মন্ড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন। এমনিতে ১৩ জুলাই বিস্ফোরণের ঘটনায় ব্যবসায়িক ক্ষতি ছাড়াও বহু হীরে-ব্যবসায়ীর মৃত্যুও হয়। সব মিলিয়ে যা পরিস্থিতি তাতে অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যবসার ঘুরে দাঁড়ানো বেশ মুশকিলের বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। প্রকৃতপক্ষে মুম্বাই-কে ভারতের অর্থনৈতিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তুলতে হীরে শিল্পের অবদান কম নয়। অনেক ব্যবসায়ীই জানিয়েছেন গুজরাটের সুরাট এবং অন্যান্য এলাকা থেকে ৮০ শতাংশেরও বেশি হীরে-ব্যবসার কাঁচামাল আসে। আসলে তিনদিক সমুদ্র-ঘেরা মুম্বাইয়ের ভৌগোলিক সুবিধা এবং মুম্বাইয়ের উজ্জ্বল অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই বহুযুগ আগেই হীরে-ব্যবসায়ীরা (যাদের মধ্যে বহুলোকই গুজরাটি) ব্যবসা ফেঁদেছিলেন এখানে। তারপর সেই ব্যবসা যেমন 'অর্থনৈতিক রাজধানী'র পক্ষে 'মানানসই' হয়ে উঠেছিল, তেমনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিও জুটেছিল এর। সেই কারণে জঙ্গিদের বহুদিনই টার্গেট ছিল হীরে-ব্যবসার ধ্বংসসাধন। ইতিপূর্বেও অনেকবারই অপেরা হাউস ও জাভেরী বাজার জঙ্গি নাশকতার শিকার হয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে গোয়েন্দারা মনে করছেন এবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই অপেরা হাউস ও জাভেরী বাজারে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন জঙ্গিরা। এর ফলে একদিকে যেমন নাশকতা সংঘটিত করাও হলো, তেমনি অন্যদিকে হীরে-শিল্পের সমূহ ক্ষতিসাধন করে 'অর্থনৈতিক রাজধানী'র অর্থনীতিকেও গুরুতরভাবে আঘাত করা গেল। জঙ্গিদের এই পরিকল্পিত ছক'ই এখন ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের।

দীর্ঘ বঞ্চনার পর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃত গৌরব ফেরাতে উদ্যোগী বিশ্বভারতী

বিশেষ সংবাদদাতা : শান্তিনিকেতন॥ রবীন্দ্রস্মৃতি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও রবীন্দ্রচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র 'রবীন্দ্রভবন' নির্মাণে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ-এর অবদান আজ বিস্মৃতির অন্তরালে। শান্তিনিকেতনে 'বিচিত্রা' গৃহের অর্ধশতবর্ষে সেই বিস্মৃত ইতিহাসকে উন্মোচিত করতেই শুরু হয়েছে রবীন্দ্রভবন সংস্কারের কাজ। তৈরি হচ্ছে আন্তর্জাতিক রবীন্দ্রসংগ্রহশালা। যার একটি প্যানেলে বিশেষ স্থান পাচ্ছেন কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রভবন' এখন কবির স্মৃতি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও রবীন্দ্রচর্চার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসাবে পরিগণিত। এর সমস্ত কৃতিত্ব অবশ্যই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের। তাঁরই নিরলস প্রয়াসে এই রকম একটি সাহিত্য ও জীবনকেন্দ্রিক অভিলেখ প্রদর্শশালা নির্মাণের সূত্রপাত হয়। কবির পঞ্চাশ বছর পূর্তির সময় থেকেই রথীন্দ্রনাথ বাবার লেখা পাণ্ডুলিপি, চিঠিপত্র সংগ্রহে যত্নবান হন। ১৯২১ সালে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর থেকে রথীন্দ্রনাথ চেষ্টা করতেন কবির লেখা ছাপার আগে মূল পাণ্ডুলিপিকে সংরক্ষণ করে প্রতিলিপি ছাপাখানায় পাঠাতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পরে রথীন্দ্রনাথই ইন্টারন্যাশানাল প্রেস-কাটিং ব্যুরোর সদস্য হয়ে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় নানা ভাষায় রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে যেসব সংবাদ ও আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার কর্তিকা (কাটিংস) সংগ্রহে উদ্যোগী হন। ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর রথীন্দ্রনাথ 'উদয়ন গৃহে'র একতলার দক্ষিণ দিকের একটি ঘর 'রবীন্দ্র মিউজিয়াম' হিসাবে ব্যবহার করতে দেন। ১৯৪২ সালের ১ জুলাই এর সূচনা হয়। রথীন্দ্রনাথ তাঁর সংগ্রহ থেকে বহু রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি, আলোকচিত্র, চিঠিপত্র আঁকা ছবি দান করে সমৃদ্ধ করেন এই সংগ্রহশালাকে। রবীন্দ্রভবন সূত্রে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের আঁকা দেড় হাজারেরও বেশি ছবি, রথীন্দ্রনাথকে লেখা কবির ১৫০টি চিঠি, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন বয়সের চারশোরও বেশি আলোকচিত্র, নোবেল প্রাইজের স্বর্ণপদক ও ডিপ্লোমা, চীন ও জাপান থেকে পাওয়া বিভিন্ন উপহার, বাংলায় প্রকাশিত ১০২টি রচনার পাণ্ডু লিপি, বহু দেশী-বিদেশী সংবাদপত্র- কর্তিকাসহ আরও বহু জিনিস রথীন্দ্রনাথ তার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে দান করে রবীন্দ্রভবনকে সমৃদ্ধ করেন। ১৯৪২ সালের ১৭ আগস্ট এই সংগ্রহশালা পরিচালনা ও উন্নয়নের জন্য একটি উপ-সমিতি গঠিত হয়। তৈরি হয় 'রবীন্দ্র-

রবীন্দ্রভবন। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ইনসেটে)

অভিলেখ্যাগার'। ১৯৪২ সালে এই অভিলেখ্যাগারটির নামকরণ হয় 'রবীন্দ্রভবন'। এই ভবনের প্রথম কিউরেটর নিযুক্ত হন গুরুদয়াল মালিক। ১৯৪৪ সালে রবীন্দ্রভবনের প্রথম অধ্যক্ষ হন কৃষ্ণ কৃপালনী। এর আগে ১৯৪১ সালে রবীন্দ্রভবনের জন্য রবীন্দ্রসম্পদ সংগ্রহের জন্য 'বিশ্বভারতী নিউজ' পত্রিকায় সর্বসাধারণের উদ্দেশে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন। এরপর ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীর সময়ে 'বিচিত্রা' গৃহনির্মিত হলে এই বাড়িটি রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রহশালা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে মানুষটির অক্লান্ত পরিশ্রমে, উদার মানসিকতার জন্য রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা এত সমৃদ্ধ কোনও এক অজানা কারণে সেই রথীন্দ্রনাথ কিন্তু সংগ্রহশালায় আজও অবহেলিত। যার অহৈতুকিদানে সমৃদ্ধ সংগ্রহশালা, সেখানে একটি ছোট ছবিতেই দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে সীমাবদ্ধ রথীন্দ্রনাথ। কোথাও লেখা নেই তাঁর অবদানের কথাও।

রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্‌কালে বিশ্বভারতীর তদানীন্তন আচার্য জওহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রভবনকে রবীন্দ্র স্মৃতিরক্ষার যথার্থকেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য বিশ্বব্যাপী এক আবেদন প্রচার করেন। ১৯৫৮ সালে ২৩ ডিসেম্বর পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৬১ সালে নতুন বাড়িটির উদ্বোধন হয় রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে। বাড়িটির নাম রাখা হয় 'বিচিত্রা'। এ বছর এই বিচিত্রা গৃহের ৫০ বছর পূর্তি। এই বিচিত্রা বাড়িতেই পাকাপাকিভাবে সংগ্রহশালা গড়ে ওঠে। এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই সংগ্রহশালাটি আন্তর্জাতিক স্তরের গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। চলছে বিচিত্রা বাড়ির সংস্কারের কাজ, নতুন সংগ্রহশালায় ৫০টি কর্নার, ৩০টি প্যানেল, ৩টি স্পেশাল কর্নার থাকছে।

রবীন্দ্র স্মৃতিসম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও রবীন্দ্র চর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রধান কারিগর রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কিন্তু দীর্ঘকাল তিনি অবহেলিত। রথীন্দ্রনাথের সেই হৃতগৌরব ফিরিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে বিশ্বভারতীর বর্তমান কর্তৃপক্ষ। তাই আধুনিক সংগ্রহশালার সম্পূর্ণ একটি প্যানেল রথীন্দ্রনাথকে নিয়েই তৈরি হচ্ছে। সেখানে থাকছে তাঁর শিল্পনৈপুণ্য, রুচি, নির্মাণকৌশল, রবীন্দ্রস্মৃতিসম্পদ সংগ্রহ, সংগ্রহশালা নির্মাণে তাঁর উদ্যোগ, ইতিহাস ও উদারতা। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ৫০ বছর পর রথীন্দ্রনাথের প্রতি অনুরাগী হলো বিশ্বভারতী।

এই বিষয়ে রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক নীলাঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রবীন্দ্রভবনের সংগ্রহশালাটি আন্তর্জাতিক স্তরে উত্তীর্ণ করার কাজ শুরু হয়েছে। একই সঙ্গে বিচিত্রা গৃহের সংস্কারের কাজ চলছে। নতুন সংগ্রহশালায় রথীন্দ্রনাথের হৃতসম্মান ফিরিয়ে দিতে এবং রবীন্দ্র সংগ্রহশালা নির্মাণে তাঁর অবদানের বিস্মৃত ইতিহাস আমরা আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিয়েছি। সংগ্রহশালায় একটি বিশেষ প্যানেলে স্থান পাবেন রথীন্দ্রনাথ।

মাতৃভূমি করে আহ্বান

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত কলিং। মানে ভারতবর্ষ ডাকছে। মাতৃভূমির আহ্বান। ভারতাত্মা স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন বাস্তবায়নের মুখে সন্দীপ মেহতোর হাত ধরে। শূদ্র বলে যাদেরকে স্বাধীনতা পূর্ব ভারতে কেবল পায়ের তলায় পেষানো-ই হয়েছিল, স্বাধীনোত্তর ভারতেও তারা কেবলই রাজনৈতিক ভোটব্যাঙ্ক মাত্র। দেশের সর্বত্র এস টি (সিডিউল ট্রাইব) কোটা স্রেফ তাঁদের জন্য বলবৎ হলেও প্রকৃত বনবাসীদের অবস্থাটা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে। মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে তিনটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান তার ন্যূনতম চাহিদাটুকুও মেটাতে সক্ষম হয়নি দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতির কারবারীরা। শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার— কথাটা তাদের কাছে প্রহসন মাত্র। উচ্চশিক্ষা জিনিসটা খায় না মাথায় দেয় জিনিসটাই বোধগম্য ছিল না বনবাসীদের। আসলে ব্যর্থতাটা বোধহয় আমাদেরই, আমরা তাঁদের মানুষ বলে আদৌ ভাবতে পেরেছি কি না— এই জিজ্ঞাসাটা ঘুরে-ফিরে আসা তাই অপ্রাসঙ্গিক নয়। তবে এই কৃতঘ্নতা থেকে মুক্তি দিতে এসেছেন সন্দীপ মেহতো।

সন্দীপ মেহতো-র সঙ্গে উচ্চশিক্ষারত ছাত্রছাত্রীরা।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ভারত কলিং'-এর নামোল্লেখ আগেই করা হয়েছে। মুম্বাইয়ের টাটা ইন্সটিটিউট অব্ সোস্যাল সায়েন্সেসের তরুণ উদ্যোগপতি সন্দীপ মেহতো মধ্যপ্রদেশের দরিদ্রতম বনবাসীদের দুয়ারে নিয়ে যাচ্ছেন উচ্চশিক্ষাকে। এ শুধু কল্পনা বিলাস নয়, হাতে-কলমে সফল করার জন্য ভারত কলিং। যেমন ধরা যাক লক্ষ্মী ইভনে-র কথাটাই। মধ্যপ্রদেশের কোনও তেপান্তরের জঙ্গল পেরনো নানদনের বলে একটা জায়গাকার গ্রামে তার বাস। ২০ কিমি পায়ে হেঁটে কেসলা বলে একটা জায়গায় স্কুলে যেত সে। স্কুলের গণ্ডীটুকু পেরোনোর পর মেয়ের লেখা-পড়া নিয়ে যথেষ্ট সংশয়েই ছিলেন লক্ষ্মীর বাবা-মা। বিশেষ করে গাঁয়ের অন্যান্য মেয়েদের হোস্টেলের পূর্বাপর অভিজ্ঞতা মোটেও সুখের ছিল না। সেই মেয়ে এখন কলেজ পেরিয়ে ইউনিভার্সিটি-র দোরগোড়ায়। সৌজন্যে ভারত কলিং। তারাই লক্ষ্মীর উচ্চশিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার, থাকা-খাওয়ার খরচ বহন করে। হোসাঙ্গাবাদ জেলায় কেসলা ব্লকের মতোই অধিকাংশ ব্লকেই সীমাহীন দারিদ্র। হোসাঙ্গাবাদ নিজেই ভারতবর্ষের দরিদ্রতম জেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। সেখানকার ৯০ শতাংশ মানুষেরই দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস। খাবার জন্যই যেখানে পয়সা নেই, বিশ্ববিদ্যালয় সেখানে তো কেবলই অধরা মাধুরী!

কিন্তু মুশকিল আসানের নাম ভারত কলিং। তাই এই হতদরিদ্র গ্রামের ছেলে-মেয়েরাও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, দেবী অহল্যা বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্দোর; সাগর কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, এমনকী টাটা ইনস্টিটিউট অব্ সোস্যাল সায়েন্সেস-এর মতো ভারতবর্ষের প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। আরও আনন্দের কথা, হতদরিদ্র সেই বিদ্যার্থীদের অর্ধেকই মেয়ে। আসলে সন্দীপ মেহতো নিজেই যে এব্যাপারে একজন ভুক্তভোগী। তাই নিজের দুর্দশা-র আর পুনরাবৃত্তি চাননি লক্ষ্মী ও অন্যান্য দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের বেলায়। কেউ ভাবতে পারে টাটা ইনস্টিটিউটের অমন উচ্চপদস্থ চাকুরে কিনা লক্ষ্মীর পড়াশোনার ইচ্ছে দেখে তাকে অনলাইনে ফর্ম তুলে দিয়ে, ৩০০ কিমি দূরে সাগর বলে একটা জায়গায় এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে নিয়ে গিয়ে ডঃ হরি সিং গৌড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া অবধি নিজে সর্বক্ষণ সশরীরে উপস্থিত থেকেছেন! স্বামীজী'র ভারত জাগছে।

পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় ভাষা উর্দু?

১১ জুলাইয়ের স্বস্তিকা'য় অম্বিকা প্রসাদ পালের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আমি আর একটু সংযোজন করতে চাই। পশ্চিমবঙ্গের যেসব অঞ্চলে ১০ শতাংশ মুসলমান আছে, সেখানে উর্দু ভাষা দ্বিতীয় ভাষার মর্যাদা পাবে বলে জানিয়েছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

আমরা জানি, বাংলার মুসলমানদের ভাষা উর্দু নয়। পূর্ব বাংলায় উর্দু ভাষা চাপাতে গিয়েই পাকিস্তানকে পূর্ববঙ্গ হারাতে হয়। পশ্চিমবাংলার মুসলমানরা এবিষয়ে নীরব কেন? ভাববার বিষয়! তাছাড়া ভারতের কোনও প্রদেশেরও মাতৃভাষা উর্দু নয়। তবে কেন কতিপয় সংখ্যালঘুকে খুশি করতে এমন সর্বনাশা প্রয়াস!

এর ভবিষ্যৎ ইঙ্গিত— প্রথমে মানুষে ভাগ, পরে দেশ ভাগ।

—বারিদবরণ গুহ, রায়বাহাদুর রোড, কলকাতা—৩৪।

।।২।।

স্বাধীনতার পর এই প্রথম একজন মহিলা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হলেন। এজন্য পশ্চিমবাংলাবাসী হিসেবে আমরা গর্বিত।

মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসেই শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী যেভাবে সি পি এমের দুর্নীতির তদন্ত ও ৩৪ বছরের জমানো অস্ত্র উদ্ধার করছেন; এককথায় সি পি এমের মুখোশ খুলে আসল চেহারাটা জনসমক্ষে তুলে ধরছেন তা প্রশংসনীয়। এর ফলে একটি কালো অধ্যায়ের শেষ হয়েছে।

রাজ্য সরকারি দপ্তরগুলোকে পার্টি অফিসে পরিণত করা হয়েছিল। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে শিক্ষার বারোটা বাজিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ছাত্র সংগঠন আছে। ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির সময়ে শুরু হয় মারামারি। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র রাজনীতি অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন উর্দু ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হবে। এইখানেই প্রশ্ন, কেন দ্বিতীয় ভাষা? নেপালী, গুরুমুখী ইত্যাদি ভাষা স্কুল, কলেজে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করুন। কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। কারণ ভাষা শিক্ষা লাভ করা ভাল। কিন্তু উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হবে কেন?

তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কয়েকটি প্রশ্ন—

১) কত সংখ্যক মুসলমান জনগণ উর্দু ভাষায় কথা বলেন?

২) কত সংখ্যক মুসলমান উর্দু ভাষা বুঝতে পারেন?

৩) বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা কি উর্দু ভাষা বুঝতে পারেন?

৪) উর্দু ভাষায় কি সরকারি দপ্তরে কাজ চালানো সম্ভব?

৫) উর্দু ভাষা কি ভারতীয় ভাষা?

আমাদের দেশের প্রধান ভাষাগুলির জননী সংস্কৃত। এই ভাষা থেকেই ভারতীয় সমস্ত ভাষার জন্ম। সংস্কৃত ভাষার বিষয়ে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। খুব আশ্চর্য লাগছে।

আপনার নিশ্চয় জানা আছে, সারা পশ্চিমবঙ্গে মাত্র চারটি সংস্কৃত কলেজ আছে। বর্তমানে ওই কলেজগুলো কোনও এক অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘকাল থেকে বন্ধ রয়েছে। কোচবিহার মহারাজা জগদীপেন্দ্রনারায়ণ সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা সংস্কৃত কলেজ, নদীয়া সংস্কৃত কলেজ, দীঘা সংস্কৃত কলেজ।

সংস্কৃত ভাষার বিষয়ে কিছু বলুন, কিছু করুন। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কি কেন্দ্র, কি রাজ্য— সবাই যেন দরাজ হস্ত। পশ্চিমবঙ্গে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শাখা মুর্শিদাবাদে খোলা হচ্ছে। সেখানে কোটি কোটি টাকা সরকার খরচ করছে।

উর্দু ভাষা শিক্ষার জন্য মাদ্রাসার প্রয়োজন নেই। স্কুল কলেজের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হলে সকল ছাত্র-ছাত্রী ওই ভাষা শিক্ষা লাভ করতে পারে। মুসলমানদের জন্য আলাদাভাবে মাদ্রাসায় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে ভারতীয় মূল স্রোত থেকে তাদের আলাদা করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে।

— অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, দেবীবাড়ী, নতুনপাড়া, কোচবিহার

রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি

রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল ৫০ টাকা। ডিজেল লিটারে ৩ টাকা এবং কেরোসিনের ২ টাকা দাম বাড়ল সম্প্রতি। কেন্দ্র রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা বাড়ালেও তা থেকে ১৬ টাকা কমিয়ে দিল রাজ্য সরকার। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে রান্নার গ্যাসের দাম সিলিন্ডার প্রতি ৩৪ টাকা বৃদ্ধি পেল। কেন্দ্রীয় সরকার সিলিন্ডার প্রতি ৫০ টাকা দাম বাড়ানোয় যে গ্যাস সিলিন্ডারের দাম এরাজ্যে ৪১৭ টাকা ১০ পয়সা হয়েছিল, তা কমে দাঁড়ায় ৪০১ টাকার কাছাকাছি। সাধারণ মানুষ খাবে কি? সাধারণ মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ জোটের শরিক তৃণমূল কংগ্রেস। কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস কেউই এই মূল্যবৃদ্ধির দায় এড়াতে পারে না। কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেস তৃণমূল জোট সরকার চলছে। সরকারি কর্মচারীদের ডি এ বাড়ে, অর্থাৎ মাসিক আয় বৃদ্ধি হয়। কিন্তু গরীব মানুষ, খেটেখাওয়া মানুষ, যারা সরকারি চাকরি করে না, যারা প্রতিদিন ডালভাত খাওয়ার জন্য লড়াই করে, তাদের কিন্তু ডি এ বাড়ে না। তাদের দৈনিক আয় বৃদ্ধি হয় না। তারা খাবে কি? কংগ্রেসের স্লোগান ছিল— আম আদমিকা হাত কংগ্রেস কা সাথ। গরীব মানুষ এখন টের পাচ্ছে, কংগ্রেস হলো কালোবাজারি ও বড়লোকদের সরকার। তাই গরীব মানুষের কাছে আজ বিকল্প একমাত্র বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার।

— কৌশিক গোস্বামী, বেলঘরিয়া, কলকাতা—৫৬

সমীক্ষা ভারতেও হোক

স্বস্তিকা-র ২৭ জুন ২০১১ সংখ্যায় অতিথি কলমে মুজফ্‌ফর হোসেনের লেখায় দেখলাম, পাকিস্তানে এক মিডিয়া কোম্পানী দ্বারা সমীক্ষায় জানা যায়, সেখানকার ৫৬ শতাংশ মানুষ ইসলামী বা খিলাফতি শাসনের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, ইসলামের নামে যখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে, তখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা পাকিস্তানের ভবিতব্য হওয়া উচিত। ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও এক সমীক্ষা চালিয়ে জানা উচিত উক্ত বিষয়ে তাদের মতামত কি। জ্যোতি বসুর শাসনকালে কলিমুদ্দিন শামস বলেন, তিনি প্রথমে মুসলমান, তারপর ভারতীয়।

'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান দিয়ে গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ও নোয়াখালি কিলিং করে যখন পাকিস্তান বানিয়ে ফেলল, তখন ভারত হিন্দুস্থান হলে নেহরু অ্যাণ্ড কোং-এর কি ক্ষতি হোত? কারণ, ইংরেজ সরকার ও মাউন্টব্যাটনদের পছন্দের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত নেহরু। তখন ইংরেজদের শত্রু ছিল হিন্দু বিপ্লবীরাই।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে রসিকতা করে বলা হোত, পণ্ডিত নেহরুই একমাত্র জাতীয়তাবাদী মুসলমান। কলিমউদ্দিন শামস যা বলেছেন, সত্যিই বলেছেন। গান্ধীজী ও নেহরুর মুসলমান তোষণ দেশভাগের পরেও ভাঁটা পড়েনি। ইসলাম, কোরান সবই শান্তির বাণী ছাড়া কিছু নয় বলে এক শ্রেণীর হিন্দু সবজান্তারা প্রচার করছে। এরা মিথ্যাচার দ্বারা হিন্দু জাতিকে প্রতারিত করছেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে।

—বৈদ্যনাথ ঘোষ, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগণা।

চল্লিশ বছর আগের এক স্মৃতি এবং সংবাদপত্র

রমাপ্রসাদ দত্ত

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ দেশপ্রেমীর সংখ্যা বেড়ে যায় গান্ধী টুপি পরে। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে যাঁরা ইংরেজের দাস হিসেবে কৌশলী ভঙ্গিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেছেন, শাসন ক্ষমতা বদলের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গিরগিটি-চরিত্র বজায় রেখে দেশপ্রেমী সাজবেন--- এটাই তো প্রত্যাশিত। এরকম ব্যাপার অতীতে হয়েছে। এ সময়ে বাদ যাবে কেন? সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে না পারাটাই বোকামি! সেই সুযোগ নেওয়ার জন্যে সবরকম প্রক্রিয়া অনুসরণে যাঁদের কোনরকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিল না তাঁরা একসময় জয়তিলক পরেছেন। এবং পরবর্তী কয়েক পুরুষের সুখসমৃদ্ধির পাকা বন্দোবস্ত হয়েছে। এমন ব্যাপারটা শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ঘটেনি, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা সক্রিয় থেকেছে। সংবাদপত্রের ক্ষেত্রেও সেই বদল অনেকটা ঘটে গেছে। খুব কম কাগজ সাংবিধানিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে আমূল চরিত্র বদল না করে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে পেরেছে। তা করতে গেলে যথেষ্ট ঝুঁকি থাকে। সব ক্ষেত্রেই তাই অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যে মানিয়ে নেওয়ার নীতি মানতে হয়। ক্ষমতাশীল নেতারা কুপিত হতে পারেন— এই আশঙ্কায় অধিকাংশ কাগজ কর্তৃপক্ষ আগেভাবে সতর্ক হতে চান। আদর্শ ধুয়ে কোন্ স্বর্গে বাতি দেওয়া যাবে, যদি কাগজই শাসকের রোষে পড়ে সঙ্কটের মুখোমুখি হয়?

কোনও কোনও নবীন সাংবাদিক সংবাদ জগতে পা রাখার পর আবেগ আনন্দে প্রাণখুলে বাক্যরচনা করতে চান। অফুরন্ত উৎসাহে নানারকম খবর জোগাড় করেন। কোনও পোড়খাওয়া সাংবাদিক লক্ষ্য করেন নবীন সাংবাদিকের তৎপরতা। তিনি প্রেরণা দেন, এগিয়ে যেতে সাহায্য করেন। পরামর্শ দেন। আবার কোন প্রবীণ সাংবাদিক সবসময় নজর রাখেন অন্যদিকে। তরুণ সাংবাদিককে পরামর্শ দেন, 'অত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। নিজেকে তৈরি করো, দেখেশুনে এগোও। মনে রেখো ঝুঁকির কাজে নামার আগে আত্মরক্ষার ব্যাপারটা ভাবতে হবে।'

সাংবাদিক খবর করলেন ঝুঁকি নিয়ে। সম্পাদক যদি সেই খবর ছাপার সাহস দেখান তাহলে সাংবাদিক উৎসাহ পেলেন। কিন্তু সম্পাদক তো নির্বাহী দায়িত্বে থাকেন। যাবতীয় আর্থিক ভারবাহী থাকেন যিনি, অর্থাৎ টাকা জোগান তিনি দেখবেন তাঁর সামনে কঠিন কোনও সমস্যা হাজির না হয়। খুব কম সংবাদপত্র মালিক বলতে পেরেছেন, 'সাংবাদিকরা যেটা ভালো বুঝবেন করবেন। তবে

দেখবেন কোনও খবর যেন বিকৃত বা অতিরঞ্জিত না হয়। ঠিক খবরটা দেবেন। খবর চাপবেন না। ছাপবেন। বাকিটা আমি সামলাবো।'

আমাদের এখানে অনেকরকম সংবাদপত্র দেখা গেছে। চরিত্র অনুযায়ী একেকরকম পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করে কাগজ এগিয়েছে। কোন কাগজ সরকারের বা শাসকদলের সরাসরি প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে ক্রমাগত ঢাক বাজিয়েছে। কোন কাগজ সরকারের গঠনমূলক সমালোচকের ভূমিকা নিয়েছে। কোন কাগজ একেবারে সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত কথা বলেছে। তার ফলে আক্রমণ এসেছে নানাভাবে। সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়েছে প্রতিমুহূর্তে। সংবাদপত্র সেসব লড়াই চালিয়েছে ধৈর্যের সঙ্গে নিষ্ঠা বজায় রেখে। অনেক খবর ঐভাবে বেরিয়ে এসেছে। সাধারণ পাঠকের অজানা থাকেনি। শাসকরা শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করতে পারেনি।

নতজানু সংবাদপত্রের পাশাপাশি মেরুদণ্ড সোজা রাখা সংবাদপত্র কাজ করে চলেছে বলেই সাংবাদিকতার জগৎ এখনও বিবর্ণ হয়ে ওঠেনি।

নীলচাষীদের পক্ষ নিয়ে কলম ধরেছিলেন যশোরের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ। কাগজটির নাম 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। ১৮৭৮ সালে সরকার দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমনের জন্যে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করল। অমৃতবাজার পত্রিকা বাংলা সাপ্তাহিক থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিকে রূপান্তরিত হলো। কিন্তু চরিত্র একই থাকল। অমৃতবাজার দৈনিক হয়েছে অনেক পরে।

শিশির কুমার ঘোষ সংবাদপত্রের মাধ্যমে লড়াই কিছুদিন চালাবার পর দায়িত্ব ভাইকে দিয়ে ধর্মচর্চায় মনোযোগী হন। শিশির কুমার ঘোষের পুত্র তুষারকান্তি ঘোষ পরে অনেক বিস্তার ঘটান। অমৃতবাজার পত্রিকা সংবাদপত্র শিল্পের অন্তর্গত হয়। বাংলা কাগজ 'যুগান্তর' প্রকাশ শুরু করেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েই। খুব কৌশলে ব্যবসা বজায় রাখতে হয় এটা জানতেন তুষারকান্তি।

তবে তাঁর আমলে এমন অনেক খবর বেরিয়েছে যা শাসকদের রীতিমতো অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে। সংবাদ শাসনের বা নিয়ন্ত্রণের সে অলিখিত নিয়ম অনেক কাগজেই থাকে তা থেকে কিছুটা মুক্ত ছিল অমৃতবাজার-যুগান্তর পত্রিকা গোষ্ঠী। ১৯৭৮ সালের পর রাজ্যের সিপিএম দল কাগজটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টায় সফল হয়। এমন কয়েকজন লোককে তারা ওই অফিসের কর্মী হিসেবে ক্ষমতা বিস্তারের সুযোগ দেয় যাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাগজটা নষ্ট করা। মালিক পক্ষেরও তাতে সায় ছিল। কারণ তাঁরা কাগজের ব্যবসার থেকে ঘরবাড়ি-ব্যবসা অনেক বেশি লাভজনক--- এটা বুঝেছেন। আর সিপিএম-এর মদতপুষ্ট লোকজন কাগজটাকে বন্ধ করার পর মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে অনেক কিছু গুছিয়ে নেওয়ার জন্যে। অমৃতবাজার-যুগান্তর পত্রিকার যে গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল তা ধুয়ে সাফ হয়ে যায় সহজেই।

বাগবাজারের পত্রিকা হাউসের সঙ্গে কংগ্রেস দলের দহরম-মহরম ভালো ছিল। তুষারকান্তি বেশ অঙ্ক কষে বিধান রায়ের মন্ত্রিসভার কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে পাঠিয়েছিলেন নিজের একমাত্র ছেলেকে। যেসব উদ্দেশ্যকে রূপ দেওয়ার জন্যে পাঠানো তা সম্ভব হয়েছিল। পরে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের মন্ত্রিসভায় পত্রিকা হাউসের দুজন মন্ত্রী ছিলেন। গৌরকিশোর ঘোষ বলতেন, 'জোড়া মন্ত্রীর কাগজ'। সেই কাগজের জোড়া মন্ত্রীর একজন তরুণকান্তি। তুষারকান্তির ছেলে। অন্যজন প্রফুল্লকান্তি। তুষারকান্তির ভাইপো। ব্যবসা ও অন্যান্য বুদ্ধি প্রফুল্লকান্তির প্রবল ছিল। রাজনীতির প্যাঁচ পয়জার খুব ভালো জানতেন।

১৯৭১ সাল। পশ্চিমবঙ্গের সব কাগজেই প্রতিদিন খবর ছাপা হয় আগের দিনের হিংসার বলির খতিয়ান। নকশালপন্থীদের জন্যে রাজ্যজুড়ে ভয়ঙ্কর অবস্থা। কেন্দ্রীয় সরকার চিন্তিত। ওদিকে সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশে শুরু হয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রাম। ভারত সরকারের পক্ষে পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী তখন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ঠিক হয়েছিল চরম পদ্ধতি নিয়ে নকশাল দমনের। ছক তৈরি হলো। রাজ্যের পুলিশ বিভাগের, স্বরাষ্ট্র বিভাগের কিছু দায়িত্বশীল ব্যক্তি, কংগ্রেস আর সিপিএম-এর বাছাই করা লোকজন নিয়ে নকশাল দমনের ব্যবস্থা পাকা করার দায়িত্ব নিলেন পত্রিকা হাউসের প্রফুল্লকান্তি ঘোষ। তিনি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সবুজ সঙ্কেত পেয়েছিলেন, 'যে কোনওরকম পথ নিন। কোনও অসুবিধা হবে না।'

১৯৭১-এর আগস্ট মাস। স্বাধীনতা দিবসের দুদিন আগে কাশীপুর বরানগরে পরিকল্পনা মাফিক গণহত্যা হলো। নকশাল নিধন। ত্রাস সৃষ্টি হলো ভয়ঙ্করভাবে। পুলিশ প্রশাসন নিষ্ক্রিয় থাকল। গণমাধ্যম দূরে থাকল। পুলিশের নিরাপত্তার মধ্যে মদত পেয়ে সিপিএম এবং কংগ্রেসের গুন্ডারা বেপরোয়াভাবে মানুষ নিধন চালায়। এরপর ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গিয়ে সিপিএম বলে 'এসব কংগ্রেস আর পুলিশের কাজ।' ওইরকম কৌশল এঁটে সিপিএম নিজেদের ধোয়া তুলসী পাতা হিসেবে প্রচার করে। পরে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে কাশীপুরের গণহত্যার কথা মনে রেখে শহিদবেদী স্থাপন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সব খবর দেখেশুনে নকশাল নেতা কানু সান্যাল বলেছিলেন, 'ভণ্ডামির জায়গা পান না? সেদিন কারা মেরেছিল আমরা ভুলিনি।'

প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে অনেকবার জব্দ করার চেষ্টা চালিয়েছিল সিপিএম। তিনি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, বরানগর কাশীপুর গণহত্যার পিছনে আমি ছিলাম। পরিকল্পনা করা হয়। তবে যারা যারা যোগ দিয়েছিল তাদের প্রত্যেকের নাম আমার কাছে আছে।' সিপিএম এরপর আর প্রফুল্লকান্তি ঘোষকে জব্দ করার চেষ্টা করেনি।

চল্লিশ বছর আগে এমন একটা কাণ্ডের সঙ্গে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিল যে কাগজ সেই কাগজই আরও একশো বছর আগে যশোরের গ্রামে থেকে লড়াই করেছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। ভাবুন ব্যাপারটা! অমৃতবাজার-যুগান্তর এখন অবশ্য শুধু অতীতের স্মৃতি ছাড়া আর কিছু নয়।

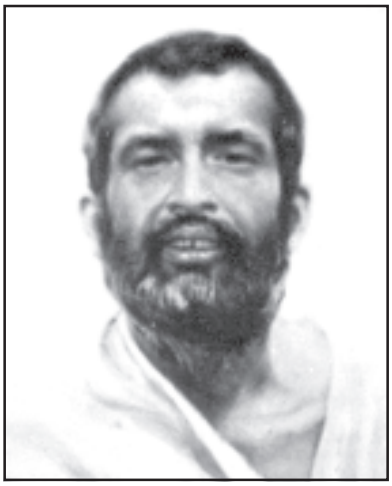

স্বামীজী'র গুরুভক্তি

স্বপনকুমার আইচ

১৯০১ সালের ১৯ মার্চ। ঢাকা-রেলস্টেশনে প্রবল ভীড়। অনেকক্ষণ থেকেই ভীড়ের প্রবাহ শুরু হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ভীড় ক্রমবর্ধমান। অসংখ্য মানুষদের আনাগোনায় মুখরিত স্টেশন-চত্বর। বেশ কয়েকজন অতি ভাগ্যবান স্বেচ্ছাসেবক ঘোরাফেরা করছেন। এই স্বেচ্ছাসেবকদের দলে হেমচন্দ্র ঘোষও আছেন, যিনি পরবর্তীকালে বিপ্লবীনায়ক, বয়স আঠার কি উনিশ। সকলের চোখ-মুখ দিয়েই ব্যাকুলতা ঝরে পড়ছে। গভীরভাবে প্রতীক্ষা করছেন তারা। তর সইছে না যেন। কার জন্য প্রতীক্ষা করছেন? বিশ্বাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্যে। একটু বাদেই তিনি এলেন। উৎসাহী জনতার মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। দম আটকে যাবার যোগাড়। অতি কষ্টে স্বেচ্ছাসেবকরা বিরাট সংখ্যক জনতার মধ্য দিয়ে 'কর্ডন' করে স্টেশনের বাইরে নিয়ে এলেন বিবেকানন্দকে। যেখানে সাজানো সুদৃশ্য দুটি ঘোড়ার গাড়ী। ইতিমধ্যে মানুষের ভীড় স্টেশন ছাপিয়ে গেল। ঢাকার বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ স্বামীজীকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন। তাঁর সম্মানে বিশাল এবং অপূর্ব-সুন্দর শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। এত বিরাট শোভাযাত্রা ঢাকাবাসী আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। শোভাযাত্রায় ছিল স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের ঢল। সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষ সেখানে ছিল। সেখানে উঁচু-নীচুর ভেদাভেদ ছিল না, ভেদাভেদ ছিল না ধনী-দরিদ্র বা সম্ভ্রান্ত- অসম্ভ্রান্তের। সকলেই সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে। কিন্তু সকলের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে ছাপিয়ে গেছে যুবকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, বিশেষতঃ ছাত্রদের। দলে দলে তাঁরা এসেছেন। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলেছে। এই অপূর্ব-সুন্দর দৃশ্য সকলকে মোহিত করছে, আপ্লুত করছে। সকলে অনাবিল আনন্দে উচ্ছ্বসিত। বার বার তারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। জয়ধ্বনি দিচ্ছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে। মুখরিত চারিদিক। একবার তারা সমস্বরে বিবেকানন্দের নামেও জয়ধ্বনি দিলে ''স্বামীজী বললেন, আমি পরমহংসদেবের দাসানুদাস। জয়ধ্বনি যদি দিতে চান শুধু তাঁর নামেই জয়ধ্বনি দিন।''

এটাই বিবেকানন্দের পরম বিনয়ের দৃষ্টান্ত, এটাই বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দের ঐকান্তিক গুরুভক্তি। এই ঘটনায় সকলেই একেবারে বিস্মিত, অভিভূত!

বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন---''জীবনে বহু বড় বড় মানুষের সংস্পর্শে আমি এসেছি। ...একমাত্র স্বামীজীই আমার সত্তার গভীরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছেন।''

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথমবার পাশ্চাত্য দেশ থেকে ফিরে আসার পর বিবেকানন্দ যখন কলকাতায় পদার্পণ করেন, তখনও তাঁকে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীরাও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। একসময় তারা সমস্বরে বিবেকানন্দের নামেও জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। এখানেও স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ করে ওঠেন। এবং গভীর আবেগের সুরে বলেন—''একান্তই যদি জয়ধ্বনি দিতে হয় তবে তা দিন শ্রীরামকৃষ্ণের নামে।''

সেই সময়ে শোভাযাত্রীদের অন্যতম এক ছাত্র জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তীতে যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে মহারাজকে এই কথা এক সময় জানিয়েছিলেন।

উপরিউক্ত ঢাকা রেলস্টেশনের ঘটনাটির স্মৃতিচারণায় বিপ্লবীনায়ক হেমচন্দ্র ঘোষ জানিয়েছেন— ''সে দৃশ্য আমার চোখের সামনে আজও যেন ভাসছে। বাস্তবিক, সেটি ছিল একটি অপূর্ব দৃশ্য।''

সূত্র : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী মহারাজের 'স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম'।

বাতরোগ বা আর্থারাইটিস

ডাঃ আর এস দাস

ছোট থেকে বড় আবালবৃদ্ধবনিতা আমরা সবাই, (কি স্ত্রীলোক কি পুরুষ মানুষ) কোনও না কোনও সময় গাঁটের ব্যথায় (অস্থিসন্ধির) ভুগি। এমন কোনও ব্যক্তি আছেন যার কখনও গাঁটে ব্যথা, হাতপায়ে ব্যথা, কোমরে, ঘাড়ে ব্যথা, মাংসপেশীতে বা হাড়ে ব্যথা হয়নি? সত্যিই তেমন কোনও মানুষ খুঁজে পাওয়া দুরূহ। পশুপাখিরও গাঁটে ব্যথা হয় বিশ্বাস করুন। রেসের ঘোড়ার অস্টিও আর্থরাইটিস হয় জোয়ান বয়সে। শুনতে আশ্চর্য লাগছে তাই না! সেই ঘোড়ার পরিণতি কি হয় তা কি জানেন? সেটাও এক মজার ব্যাপার। তবে সেটার প্রসঙ্গে পরে যথাসময়ে অন্য প্রবন্ধের মধ্যে লিখে জানাব। যাই হোক, গাঁটে ব্যথা বা বাতরোগ বহু হাজার বছর ধরে মানুষের মধ্যে চলে আসছে। মিশরের মমির হাঁটু বা কোমরের হাড়ের X-Ray করে জানা যায় তাদের OSTEOARTHRITIS হোত। হাড়ের টিবি রোগের সন্ধান পর্যন্ত পাওয়া গেছে মমির মধ্যে।

বৃদ্ধ বয়সে বয়সের জন্য যে ব্যথা হয় তার নাম OSTEOARTHRITS; যে কোনও ওজন বহনকারীর গাঁটে বা অস্থিসন্ধিতেই এটা হতে পারে ৪০—৬০ এর মধ্যে। হাঁটু, গোড়ালি, কুঁচকির সংযোগস্থল গুলো সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। OSTEOARTHRITS কেন হয়? স্বল্প কথায়, দুটি ছোট বা লম্বা হাড়ের মাঝে ১টা স্পঞ্জের মতো হালকা কার্টিলেজের বালিশ থাকে। সেইটা বয়সজনিত কারণে বেশি পরিশ্রমে (কুলিয়া), বেশি ওজন (মোটা মহিলারা) নিয়ে রোজ সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা বা ফুটবল খেলোয়াড়রা এই রোগের শিকার হন। তাছাড়া বিভিন্ন পদার্থ (যেমন ইউরিক অ্যাসিড, ফসফেট, oxalate কপার, আইরন, ক্যালসিয়াম) ওই বালিশে জমা হয়ে সেটার ক্ষতি করে। তার যে ইলাসটিসিটি সেটা কমে যায়; ওই কুশনটা আর SHOCK ABSORB করতে পারে না। তার ক্ষয়বৃদ্ধি হতেই থাকে। ওই বালিশ বা কুশনকে খাদ্য যোগায় অস্থিসন্ধির মধ্যে হয়ে থাকা এক ধরনের লসিকা রস যার নাম SYNOVIAL FLUID; বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিমাণে কমে যায় এবং আস্তে আস্তে ওই কুশনও ক্লিষ্ট ও কৃশতনু হয়। এর ফলে প্রান্তীয় হাড়ের ঘর্ষণ হয় এবং হাঁটাচলা করলেই হাড়ে হাড়ে ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যথার সৃষ্টি হয়। এর লক্ষণ কি? এর Symtom এবং Signs গুলো হচ্ছে— বেশী হাঁটাচলা, সিঁড়িভাঙ্গা বা খেলাধুলোর পর ব্যথা, বেদনা, ফুলে যাওয়া, গরম হয়ে যাওয়া, ক্লিকক্লিক করে শব্দ হওয়া (CREPINGS),

সময় সময় হাঁটার সময় হাঁটু ভাঁজ না করতে পারা [LOCKING] ইত্যাদি ইত্যাদি। কুঁচকি, হাঁটু বা গোড়ালীর জয়েন্ট গুলোর সাধারণ নড়াচড়ার ব্যাঘাত ঘটায়। অনেক সময় হাতের আঙুলের পাশে BOUCHARD'S HEBZRDEN'S NODE—নামক শক্ত বেদনাদায়ক গুটুলি দেখা যায়। ডাইয়াগনোসিস কিভাবে হয়? খুব সোজা কথায় উপরিউক্ত লক্ষণগুলোই প্রধান। তাছাড়া রক্তপরীক্ষা, X-Ray MRICSCAN, ARTHROSCOPY ইত্যাদিতো আছেই। উপশম বা উপাচার কি?

সত্যি বলতে কি এর কোনও permanent cure নেই। (ক) লাইফস্টাইল মডিফিকেশন : (খাওয়া-দাওয়া নিয়ন্ত্রণ; ধূমপান যা হাড়ের ক্ষতি করে, (osteoportis) (cartilage loss) মদ্যপান ইত্যাদি কম করা বা বন্ধ করা। ওজন কমান। নিয়মিত ব্যায়াম করা, বেশি করে শাকসবজি (Anti oxidant) ও ফলমূল খাওয়া।

(খ) মেডিক্যাল ম্যানেজমেন্ট : ব্যথার ওষুধ খাওয়া, ব্যথার ওষুধ লাগানো, ইনজেকশান নেওয়া। কুশনের ক্ষয় প্রতিরোধক ওষুধ বেরিয়েছে। SYNOVIN FLUID এর প্রায় বিকল্প বাজারে পাওয়া যায়। সেটা অস্থিসন্ধির এর মধ্যে ঢোকানো যায়। ব্যথা কমানোর জন্য মুখে খাওয়া বা লাগানোর ওষুধ অসংখ্য রকম। তবে এগুলোর পার্শ্বক্রিয়াও (Side Effect)-ও কিছু কম নয়। তাই উপযুক্ত ডাক্তারের (Rheumatlogist)-এর পরামর্শ মতো এগুলোর ব্যবহার অতি অবশ্য করণীয়।

(গ) ফিজিওথেরাপি : নানা রকম ব্যায়াম যাতে করে বিভিন্ন মাংসপেশী (যেগুলো Joint এর চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে) এগুলোকে বলবান করে তোলা। তারা একে অপরের বিপরীত মুখে হাড়গুলোকে টানবে যাতে করে হাড়ে হাড়ে ঘর্ষণটা কমে যাবে। ব্যথাও কম হবে। এছাড়া আছে WAXBATH; গরম জলের সেঁক। ($MgSO_4$ এবং গ্লিসারিন দিলে ফোলাটা কমে যায়); SHORT WAVE DIATHFRMY; INFRARED RAYS ইত্যাদি ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগ করা হয়।

(ঘ) বাকি থাকলো সারজারি বা অপারেশন! সেটা হাড়ের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা করেন। মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে অস্থিসন্ধির মধ্যে সরু নল ঢুকিয়ে ARTHROSCOPIC SURGERY করা যায়। অথবা চিরাচরিত প্রথায় গোটা অস্থিসন্ধিটাকে পাল্টিয়ে ফেলা। যেমন আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাননীয় বাজপেয়ীজীর ক্ষেত্রে করা হয়েছে।

এর পরের লেখার আর এক প্রকার গেঁটে বাতের ব্যথার কথা বলবো। তার নাম RHEUMA TOID ARTHRITIS.

[সম্পর্ক সূত্র : ৯৯৩৩৪২০৭৬৮]

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। **নির্মল কর** ।।

চুম্বন পরিমাপক

বিজ্ঞানের চোখে ফক্কিকারী এখন অচল। সে এখন প্রেমের ঘরে উঁকি দিয়ে নজরদারি চালাচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রেটওয়েসার ‘কিসোগ্রাফ’ নামে একটি চুম্বন পরিমাপক যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। চুম্বনের প্রকৃতি নিয়েও যন্ত্রটি তার প্রতিক্রিয়া জানাবে; চুম্বনটি স্নেহের, প্রেমের নাকি লালসার—‘কিসোগ্রাফ’ মুহূর্তেই জানিয়ে দেবে; ধরা পড়বে অনিচ্ছাকৃত চুম্বনও। চুম্বনের আবেগ এবং চুম্বনজাত শিহরণের গভীরতা কতটা সংবেদনশীল, এই কিসোগ্রাফ তাও সশব্দে জানিয়ে দেবে।

কদলীপত্র

কলার তন্তু থেকে তৈরি হয়েছে এক ধরনের শক্তপোক্ত কাগজ। একশো বছরেও বিবর্ণ হবে না বা তিন হাজারবার ভাঁজ করলেও কাটবে না। এই কদলীপত্র তৈরি করেছেন গুজরাটের নবসারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। পার্চমেন্টের বদলে এই বিশেষ কাগজে কারেন্সি-নোট ছাপা যায় কিনা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখছেন।

লেখকের মুড

রুশ লেখক আন্তন চেখভ চিৎকার চেঁচামেচি ছাড়া লেখাই শুরু করতে পারতেন না। এই লেখালেখিতে মদতের জন্য তিনি প্রায়ই আমুদে আর গল্পবাজ লোকদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করে ভুরিভোজ খাওয়াতেন। গল্পে গানে হুল্লোড়ে আসর যখন জমে উঠত, চেখভ তখন হলঘরের এক কোণে কাগজ-কলম নিয়ে লিখতে বসতেন।

রঙ্গকৌতুক

ভাড়াটে (নতুন পাড়ায় বাড়ি খুঁজতে এসে) : পাড়াটা কেমন, শান্তিপূর্ণ তো?

দালাল : তা আর বলতে! কাল দিনদুপুরে দু-দুটো ডাকাতি হয়ে গেল অথচ কাকপক্ষীটি টের পেল না!

***

—যারা টক খায় না তারা কী করে?

—বোধহয় ‘নাটক’ করে।

***

শিক্ষক : বল্ সাইক্লোন কাকে বলে।

ছাত্র : স্যর, সাইকেল কেনার সময় যে লোন নেওয়া হয় তাকেই বলে সাইকলোন।

***

চোর ঘরের দামি জিনিস ব্যাগে পুরে পালাচ্ছে, এমন সময়ে ঘুম ভাঙলে টুকু চোরকে ডাকল : চোরকাকু, আমার স্কুল ব্যাগটাও নিয়ে যাও।

চোর : সেকি, তুমি পড়বে না?

টুকু : নিয়ে যাও বল্‌ছি, নইলে এক্ষুনি চেঁচিয়ে তোমাকে ধরিয়ে দেব।

***

দীপ : পাপাই, কফিটা তাড়াতাড়ি শেষ কর।

পাপাই : কেন রে, তাড়া কিসের?

দীপ : জানিস না, এখানে হট-কফি দশ টাকা আর কোল্ড-কফি কুড়ি টাকা!

--**নীলাদ্রি**

মগজচর্চা

১। পুরাণ মতে অগ্নিদেবতার স্ত্রীর নাম কী?

২। ডলার ও পাউন্ডের মতো সম্প্রতি কোন্ দেশের মুদ্রাকে চিহ্নিত করতে একটি বিশেষ চিহ্নের ব্যবহার চালু হলো?

৩। কোন্ প্রাণীর উচ্চতা বা দৈর্ঘ্য মাপতে মানুষের হাতের মাপের একক বা হ্যান্ডস (hands) ব্যবহার করা হয়?

৪। নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের আদি নাম কী ছিল?

৫। টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশিবার কট্ অ্যান্ড বোল্ড্ করার রেকর্ড কার?

—**নীলাদ্রি**

উত্তর ঃ ১। স্বাহা, ২। ভারতের, ৩। ঘোড়ার, ৪। ক্যাম্পবেল হসপিটাল, ৫। অনিল কুম্বলের

স্যোসাল ওয়ার্কের চাহিদা বাড়ছে

কেরিয়ার হিসেবে সোস্যাল ওয়ার্ক বিষয়টি জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে আজ কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে সেকথা সবিস্তারে জানাচ্ছেন ***নীল উপাধ্যায়।***

বর্তমানে এদেশে প্রায় ৩৫০টি কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সোস্যাল ওয়ার্কের উপর আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, পোস্টগ্র্যাজুয়েট কোর্স, এম ফিল এবং পি এইচ ডি প্রোগ্রাম করানো হয়।

সোস্যাল ওয়ার্ক বিষয়টিকে কেরিয়ার হিসেবে নিতে চাইলে পড়ার পাশাপাশি নিজস্ব কিছু গুণেরও প্রয়োজন। যথা—নম্রতা এবং জনসংযোগের ক্ষমতা বা দক্ষতা এক্ষেত্রে খুবই জরুরি। প্রয়োজন মনের জোরও। কারণ, সোস্যাল ওয়ার্ক নিয়ে পড়া শেষে যে ধরনের কাজ মেলে, তা সাধারণ ডিউটি আওয়ারের বাইরেও করতে হয়। সোস্যাল ওয়ার্ক নিয়ে পড়ার সময়ই দক্ষতা বাড়ানোর ট্রেনিং দেওয়া হয় এবং পাঠক্রমও সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে। যাতে শিক্ষার্থী বিশাল সংখ্যক মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজ শেষ করতে পারে।

বি এস ডব্লু বা ব্যাচেলর ইন সোস্যাল ওয়ার্ক পড়ে যে কোনও স্নাতকদের মতোই সুযোগ সুবিধে পাওয়া যায়। সোস্যাল ওয়ার্ক স্কুলে পড়ানো হয় না। ফলে স্কুল শিক্ষক হওয়ারও সুযোগ থাকছে না। তবে ডব্লু বি এস সি, পি এস সি পরীক্ষায় পাশ করলে অন্যান্যদের চেয়ে কিছু সুযোগ বেশি পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে সরকারের সোস্যাল ওয়েলফেয়ার প্রোগ্রামে সোস্যাল ওয়ার্কের ছাত্রছাত্রীরা সুযোগ বেশি পায়।

যোগ্যতা : বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি এস ডব্লু পড়ার জন্য এইচ এস পরীক্ষায় আর্টিস, সায়েন্স বা কমার্স নিয়ে ৬০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। এবং বি এস ডব্লুতে ভর্তি হওয়ার জন্য এদেশের ১৬টি সেন্টারে ভি বি ক্যাট পরীক্ষা নেওয়া হয়। এম এস ডব্লু পড়ার জন্য স্নাতকস্তরে ৫০ শতাংশ নম্বর থাকতে হবে। এম এস ডব্লুতে ভর্তি হওয়ার জন্য ডিপার্টমেন্টে লিখিত পরীক্ষা, জি ডি গ্রুপ ডিসকাশন এবং পি আই পারসোন্যাল-এর ব্যবস্থা করা হয়।

সোস্যাল ওয়ার্ক নিয়ে পড়ার পর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কাজের দক্ষতা অনেকগুণ বেড়ে যায়। যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা তৈরি হয়। সোস্যাল, পলিটিক্যাল এবং ইকনমিক্যাল ইস্যু সম্পর্কে জ্ঞানও তৈরি হয়। এ কারণে যে-কোনও সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে সোস্যাল ওয়ার্কের ছাত্রছাত্রীদের ধারণা পরিষ্কার থাকে এবং সমস্যার সমাধানও তারা অনায়াসে করতে পারে।

এখনও পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ক্যাম্পাস সিলেকশনে ডাক পেয়ে চাকরি করছে এমন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অজস্র। আর তাদের মাস- মাইনেই শুরু হচ্ছে ১৫ হাজারের বেশি থেকে। ৩৫ হাজার টাকার চাকরিও হয়েছে প্রধানত ন্যাশনাল লেভেল এন জি ও-গুলি থেকে। তার মধ্যে রয়েছে পি আর এ, ডি এ এন, বি এ এস আই এক্স প্রভৃতি। আবার সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে সি এ পি এ আর টি, ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডিং এজেন্সি যেমন সি আই এফ, ও এক্স এফ এ এম। এছাড়াও বেশ কিছু কর্পোরেট কোম্পানিও রয়েছে।

বিদেশে কাজের ক্ষেত্রেও সোস্যাল ওয়ার্ক অনেকটাই সুযোগ করে দেয়। বিশেষত ইওরোপ বা অন্যান্য উন্নত দেশে সোস্যাল ওয়ার্কের কদর রয়েছে। স্টেট গভর্নমেন্ট রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট, এন আর ই জি এস এবং হেল্‌থ প্রোগ্রামের জন্য সোস্যাল ওয়ার্কাদের কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে চাকরি দেয়। এখানে প্রতি মাসে ১৭ হাজার টাকা থেকে ৩৫ হাজার টাকার মতো মাইনে থাকে। স্থানীয় এন জি ও গুলিও প্রজেক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য সোস্যাল ওয়ার্কারদের নিয়োগ করে।

অন্যরকম পেশা ফায়ার টেকনোলজি

ফায়ার টেকনোলজি পেশা হিসেবে বেশ অন্যরকম। জানিয়েছেন ***নীল উপাধ্যায়।***

দেশে জনসংখ্যা, শপিংমল এবং শিল্পায়ন যত বাড়বে, ততই বেশি হবে অগ্নিনির্বাপণ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনাও। দমকল বাহিনীতে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের রীতিমতো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কেরিয়ার অপশন হিসেবে ফায়ার টেক্‌নোলজি একটু অফবিট হলেও অন্যান্য পেশার চেয়ে এর গুরুত্ব কম নয়।

কাজের ধরন

অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ করে তোলাই এই কোর্সের প্রধান কাজ। ফায়ার ফাইটিং থেকে শুরু করে সেফ্‌টি, প্রোটেকশন এবং এই সংক্রান্ত আরও অনেক খুঁটিনাটি কাজের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। ঝুঁকি নেবার জন্য যথেষ্ট সাহস থাকা চাই। যাঁরা প্রতিদিনের ছকে-বাঁধা নিশ্চিন্ত জীবন মেনে চলতে ভালবাসেন, তাঁদের জন্য এ পেশা নয়। অন্যের প্রাণ বাঁচাতে ঝুঁকি নিতে হবে নিজের প্রাণের।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক অথবা সমতুল কোনও পরীক্ষায় ভাল রেজাল্টসহ পাশ করতে হবে, সেইসঙ্গে যথেষ্ট ফিজিক্যাল ফিট্‌নেস থাকা চাই।

কোর্সের বিষয়

বেসিক ফায়ার-ফাইটিং ট্রেনিং, সেফটি, প্রোটেকশন, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইমারজেন্সি কেয়ার, ব্রিদিং অ্যাপারেটার্স অ্যান্ড এঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয় কোনও কোর্সের অধীনে পড়ানো হতে পারে। তবে সব কলেজে একই রকম কোর্স বা বিষয় নাও পড়ানো হতে পারে। তাছাড়া কোর্সের সময়সীমাও বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন রকম হতে পারে।

পড়ার খরচ

বছরে মোটামুটি প্রায় ৫০ হাজার টাকা লাগে।

চাকরির সুযোগ ও বেতন

সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় স্নাতকদের জন্য অনেক সুযোগ থাকে। প্রতিরক্ষা, রেল, তেল-শোধনাগার, গ্যাসপ্ল্যান্ট, পেট্রোল পাম্প, পুরসভা, দমকল বাহিনী, বিভিন্ন বড় শিল্পাঞ্চল ইত্যাদি জায়গায় চাকরির সুযোগ থাকে।

সরকারি চাকরিতে প্রথম বেতন মাসে ৮ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

বেসরকারি জায়গায় যোগ্যতার ভিত্তিতে এই অঙ্কটি ১৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকাও হতে পারে।

পড়ার জায়গা

গুজরাতের কলেজ অব্ ফায়ার টেক্‌নোলজি ভারতের প্রথম অগ্নিনির্বাপণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার প্রতিষ্ঠান। এই বিষয়ে এখানে বি এস সি ডিগ্রি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কোর্স তিন বছরের। উন্নত প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের লিড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গেও গাঁটছড়া বেঁধেছে এই কলেজ।

সাহিত্য পরিষৎ রক্ষা-সমিতির সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

উনিশ শতকের অন্তিমে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে অগ্রণী প্রতিষ্ঠান বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বাম-আমলে এসে হারায় তার কৌলীন্য ও মর্যাদা। সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকার বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধ্বংসে যে চক্রান্তের জাল বুনেছিল, তার পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল সাহিত্য পরিষৎ। তাই এই প্রতিষ্ঠানটিকে রক্ষা করতে সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বিদগ্ধ মানুষজন বাম-আমলেই গড়ে তুলেছিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ রক্ষা সমিতি।

গত ২২ জুলাই বিকেলে মহাবোধি সোসাইটি হল-এ রাজ্যের বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং ক্রেতা-সুরক্ষা মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সাধন পাণ্ডেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে তাঁদের দুই সহযোদ্ধাকে সম্মানিত করল পরিষৎ রক্ষা-সমিতি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়, অভ্যর্থনা সমিতির আহ্বায়ক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পরিষৎ রক্ষা সমিতির সম্পাদক ডঃ শঙ্করপ্রসাদ নস্কর প্রমুখ।

এন ও ই ডব্ল্যুর আলোচনা সভা

আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করতেই কেন্দ্র বীমাক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানোর বিল আনতে চলেছে বলে অভিযোগ করলেন বি এম এসের সর্বভারতীয় সভাপতি সি কে সাজিনারায়ণন। ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন অব ইন্স্যুরেন্স ওয়ার্কারস সহ ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের একাধিক সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা চক্রে গত ২৩ জুলাই বেলা দু'টো নাগাদ স্টার থিয়েটারের সভাঘরে বক্তব্য রাখেন শ্রী সাজিনারায়ণন।

প্রসঙ্গত, কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার সংসদের আসন্ন বাদল অধিবেশনে একটি বিল আনতে চলেছে। যার মুখ্য বিষয় হলো বীমাক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগ ২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৯ শতাংশ হবে। এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক নিয়েই এদিনের আলোচনা সভায় মুখ্য বিষয় ছিল।

আলোচনা সভার শুরুতে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রী সাজিনারায়ণনসহ বাংলার বিখ্যাত ফটোগ্রাফী সংস্থার কর্ণধার তথা বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক অতনু পাল।

প্রধান বক্তা হিসাবে শ্রী সাজিনারায়ণন

সংস্কার ভারতীর নৃত্য কর্মশালা

গত ১৬, ১৭ জুলাই সংস্কার ভারতীর দক্ষিণবঙ্গ শাখার রজত জয়ন্তী উপলক্ষে দু'দিন ব্যাপী নৃত্য কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার প্রথমদিন কলকাতার কল্যাণ ভবন ও দ্বিতীয় তথা শেষদিন কেশব ভবনে আয়োজিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত ৬৫ জন শিক্ষার্থীকে নৃত্য প্রশিক্ষণ দেন প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী কোহিনূর সেনবরাট। তাঁকে সহযোগিতা করেন আরেক বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সংযুক্তা সেনগুপ্ত। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন সংস্কার ভারতীর রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় প্রমুখ। (ছবিতে) শিক্ষার্থীদের নৃত্য-প্রশিক্ষণরত কোহিনূর সেন বরাট।

সমাবেশ সমাচার

বলেন, ২০০৮ সালে বিশ্বজুড়ে যে অর্থনৈতিক মন্দার সূচনা হয়েছিল তাতে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোই মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ভারতে তার সামান্য প্রভাব পড়লেও ভারতীয় অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ও বীমা ক্ষেত্রের স্থিতিশীল অবস্থা এবং সুষ্ঠু সম্ভাবনার জন্য এই মন্দার আঁচ সেভাবে পড়েনি।

প্রাথমিক শিক্ষক সঙ্ঘের অভ্যাসবর্গ

গত ২৬ জুন কলকাতার নরেশভবনে অনুষ্ঠিত হলো বঙ্গীয় নব-উন্মেষ প্রাথমিক শিক্ষক-সঙ্ঘের ১ দিনের অভ্যাসবর্গ। বর্গে পশ্চিমবঙ্গের ৮টি জেলা থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় মহাসঙ্ঘের সংগঠন সম্পাদক মহেন্দ্র কাপুর। উপস্থিত ছিলেন আর এস এসের বরিষ্ঠ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত। সংগঠনের রাজ্য-সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সাহা স্বাগত ভাষণ দেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেশবরাও দীক্ষিত, অজিত বিশ্বাস, মহেন্দ্র কাপুর, সোমেন দাস প্রমুখ। বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধিরা প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। প্রসঙ্গত, আগামী ২৭-২৮ আগস্ট ছত্তিশগড়ের বিলাসপুরে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সর্বভারতীয় প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন।

পাণ্ডুয়ায় গুরুপূর্ণিমা উৎসব

গত ১৫ জুলাই হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া 'রাজা হরিশচন্দ্র' প্রভাত শাখার উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের গুরুপূর্ণিমা উৎসব পালন করা হয়। ওই উৎসবে প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলী বিভাগ প্রচারক প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং সভাপতি ছিলেন ভাঙাপাড়া-তোরগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অশোক রায়।

শহিদের রক্তে নেতা-নেত্রী তখ্‌তে

শিবাজী গুপ্ত

শহিদ বা শহীদ শব্দটি একটি আরবি শব্দ। ওদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে মারদাঙ্গা হানাহানি লেগেই থাকত। ধর্মযুদ্ধে নিহত বা ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভের জন্য আত্মোৎসর্গকারী ব্যক্তিদের শহিদ আখ্যা দেওয়া হোত। মুসলমানদের আগমনের আগে ভারতবর্ষে ধর্মীয় হানাহানি ছিল না বলে এ জাতীয় শব্দের ব্যবহার ছিল না। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে যাদের প্রাণহানি ঘটত তাদের বিপ্লবী বলেই বলা হোত। ইংরেজরা বলত টেররিস্ট।

কিন্তু কমিউনিস্টরা যখন স্বাধীনতার পর রাজনীতি ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের নীতি প্রয়োগ করতে লাগল— কারণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে তাদের কোনও আস্থা ছিল না, তখনই আইনানুগ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত সরকারের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধে। জোর করে ক্ষমতা দখল করা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে নিজেদের শক্তি জাহির করার মানসিকতা তাদের পেয়ে বসে। তারা যে আদর্শে বিশ্বাসী — সোভিয়েট রাশিয়া থেকে ধার করা মার্কসীয় আদর্শের মূল কথাই হলো বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস। সুতরাং অহিংস গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়, সহিংস সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমেই ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে হবে— এ কথাই তাদের দলীয় আদর্শে বিশ্বাসী ছাত্র ও যুবসমাজকে অহরহ শোনাতে থাকে, উত্তেজিত করতে থাকে। তাতে যদি রক্তপাত হয়, প্রাণ দিতে হয় কুছ্‌পরোয়া নেই। তোমাদের নাম শহিদ লিস্টে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

রাজনীতিতে হিংসা ও হানাহানির প্রেরণাদাতা হলো বামপন্থীরা, বিশেষত কমিউনিস্টরা। তারা নারী শিশু যুবক ছাত্র-ছাত্রীদের শোভাযাত্রার পুরোভাগে রেখে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে এগিয়ে যায়, রাইটার্স বিল্ডিং দখলে মদত দেয়। লালবাজার অভিযানে উৎসাহ জোগায়, পুলিশকে আক্রমণে উত্তেজিত করে। পুলিশ লাঠি বা গুলি চালালে কেউ নিহত হলেই সে শহিদ হয়ে যায়। তার মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। নারী শিশু হলে তো কথাই নেই, নারীঘাতী শিশুঘাতী বলে সরকারকে আচ্ছাসে গাল দেওয়া যায়।

আর যদি বেটাচ্ছেলে মারা যায়, তাহলে স্লোগান ওঠে— শহিদ নেড়া তোমায় ভুলিনি ভুলব না, শহিদ ভন্টা যুগ যুগ জিও। এই শহিদ বানাবার কারিগর হলো কম্যুনিস্টরা। তাদের এই খেলা শুরু হয়েছে স্বাধীনতার দু'তিন মাসের মধ্যে ড. প্রফুল্ল ঘোষের পাঁচ মাসের মন্ত্রিত্বকালে। ১৪৪ ধারা লঙ্ঘন, বিধানসভা ঘেরাও ইত্যাদি অগণতান্ত্রিক কাজের মাধ্যমে পুলিশকে গুলি চালাতে বাধ্য করা হয়। একজনের মৃত্যু হয়। শুরু হয় মৃতদেহের রাজনীতি। সে খেলা কম্যুনিস্টরা ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ রাইটার্স-বিল্ডিং-এ প্রবেশ পর্যন্ত চালিয়ে যায়। বহু নিরপরাধ নরনারী ছাত্র যুবক এই রাজনৈতিক দাবাখেলার মাঝে পড়ে অকালে প্রাণ হারায় এবং শহীদত্ব প্রাপ্ত হয়। আর তাদের রক্তে রঞ্জিত পথ মাড়িয়ে নেতা-নেত্রীরা গিয়ে বসেন মন্ত্রিত্বের কুর্শিতে।

কমিউনিস্টরা এই খেলা চালিয়েছিল ৩০ বছর। প্রতিদান হিসাবে তারা রাইটার্সে ঢোকার অধিকার অর্জন করে। কিন্তু মন্ত্রিত্বে ঢুকেও তাদের রক্তের নেশা কাটেনি। সাঁইবাড়ি, বিজন সেতু, মরিচঝাঁপি, বানতলা ইত্যাদি কাণ্ডে তারা তাদের জীঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করে। তবে এদের আর শহীদ বানানো যায়নি। বা প্রয়োজনও হয়নি।

তখন আসরে অবতীর্ণ হলেন পরিবর্তনপন্থী দলের নেত্রী ও নেতারা। তারাও ধর্না, অভিযান, ঘেরাও, আইন অমান্য অস্ত্র প্রয়োগ করে বেশ কিছু সংখ্যক শহিদ বানিয়ে ফেলেছে। তাদের মৃতদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা, শ্মশান গমন ও শবদেহে স্যালুট ও মাল্যদান ইত্যাদি কম্যুনিস্টি কাণ্ড বেশ রপ্ত করে ফেলেছে। এবং তার ডিভিডেন্টও পেয়েছে গত বিধানসভা নির্বাচনে। গদি দখলের এটা একটা সহজ পন্থা। পরের ছেলেকে শহিদ বানিয়ে নিজের ছেলের গদি দখলের পথ পরিষ্কার করা। কারণ এতো খুন খারাপির মধ্যে কোনও নেতা-নেত্রীর বা তাদের ছেলেমেয়ের খুন হবার খবর জানা যায়নি। যা শহিদ পরে পরে, গদি আসুক আমার ঘরে।

সোজা কথায় একে বলে খুনের রাজনীতি। এই খুনের রাজনীতির ফসল কম্যুনিস্টরা তুলেছে দীর্ঘ ৩৪ বছর এবং মন্ত্রিত্বের গদিতে এমনিই ফেবিকল হয়ে বসেছিল যে, সেখান থেকে তাদের কেউ হটাতে পারে সে চিন্তাই তারা করতে পারেনি। ক্ষমতান্ধতা একেই বলে। তাই গদিহারা হয়ে সর্বহারার দল দিশাহারা হয়ে পড়েছে। এবং পরাজয়ের কারণ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। যে শহিদের রক্তে তাদের বোধন, সে রক্তেই যে বিসর্জন, তা বোঝার মতো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

খুনের রাজনীতির ফসল কম্যুনিস্টরা তুলেছে দীর্ঘ ৩৪ বছর এবং মন্ত্রীত্বের গদিতে এমনিই ফেবিকল হয়ে বসেছিল যে, সেখান থেকে তাদের কেউ হটাতে পারে সে চিন্তাই তারা করতে পারেনি। ক্ষমতান্ধতা একেই বলে। তাই গদিহারা হয়ে সর্বহারার দল দিশাহারা হয়ে পড়েছে। এবং পরাজয়ের কারণ হাতড়ে বেড়াচ্ছে। যে শহিদের রক্তে তাদের বোধন, সে রক্তেই যে বিসর্জন, তা বোঝার মতো সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানও তারা হারিয়ে ফেলেছে।

রঙ্গম

অন্য ধারার ছবি ‘ইচ্ছে’

বিকাশ ভট্টাচার্য

প্রত্যেক মা-বাবাই চান তার সন্তান লেখাপড়া শিখে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হোক। আজকের ইঁদুর দৌড়ের যুগে শুধুমাত্র লেখাপড়া করলেই তো হবে না। হতে হবে টপার। না হলে গড়পড়তা চাকুরে হয়ে জীবন কাটাতে হবে। মমতা তার শিশুপুত্রকে তাই সবসময় পড়াশোনার পরিবেশে রাখে। ঘুমচোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে তাকে স্কুলের পড়াগুলো আবার একবার কানের কাছে আউড়ে যায়। এমনকী রিকসায় স্কুলে পথে যেতে যেতে একহাতে সান্ডুইচ অন্য হাতে পড়ার বই। স্কুলের গেটে ঢুকিয়ে দিয়েও ছুটে গিয়ে মনে করিয়ে দেয়। পরীক্ষার খাতা যেন শেষে একবার রিভাইস করে। মায়ের কড়া নজরে বেচারী শমীক এক দণ্ডও নিজের মতো করে বাঁচতে পারে না। পরীক্ষার পর স্কুল থেকে বেরিয়েই দেখে তার মা দাঁড়িয়ে আছে। হাত থেকে কোশ্চেন পেপার নিয়ে শুরু হয় তাঁর জিজ্ঞাসা! ভুল হলেই প্রহার। লজ্জায় শমীক গুটিয়ে যায়! তার বন্ধুরা চারিদিকে

মা সোহিনী

দাঁড়িয়ে দেখে শমীকের মা পরীক্ষার খাতায় সামান্য একটু ভুলের জন্য কিভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়েই শমীককে মারছেন। মমতা অপারগ। তার শমীকের যে একটু ভুল হলেও চলবে না। তাকে যে টপার হতে হবে।

মমতার স্বামী এল আই সি-র এক সাধারণ অফিসার। ভবানীপুরের পৈত্রিক বাড়িতেই বৌ আর একমাত্র পুত্র শমীককে নিয়ে তার দিন কেটে যায়। তার আর কোনও উচ্চাশা নেই। এমন উচ্চাশাহীন স্বামী, এমন সেকেলে বাড়ি— এসব তো মমতা চায়নি। তাই সে আঁকড়ে ধরে আছে তার পুত্র শমীককে। তাকে নিয়েই তার সমস্ত স্বপ্ন। শমীক কিন্তু পড়াশোনায় ভালোই। কুইজ-এ সে অনেক ভালো ভালো স্কুলের ছেলেদের হারিয়ে দেয়। মমতার তো এটুকুতে হবে না। তার ছেলে হবে টপার। সে রিসার্চ স্কলার হবে। বিদেশে যাবে। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, হাভার্ড-এ লেকচার দেবে। কাগজে ছবি বেরোবে। টিভিতে টক দেবে।

মমতার স্বামী বলে, এসব তোমার ইচ্ছে। ছেলের ওপর তুমি চাপিয়ে দিতে চাইছো। ছেলে কি চায় সেটা ভেবেছ কি? মমতা কিন্তু জানে সে যা চায়— তা ছেলের মঙ্গলের জন্যেই। তার জীবনের সমস্ত কৃচ্ছ্রসাধন তা ওই ছেলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা ভেবেই। মমতা কি ঠিক ভাবছে? ছেলেকে নিয়ে তার এই একরোখা চিন্তা কি শমীকের জীবনকে উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যেতে পারবে? এসব জানতে হলে আপনাদের দেখতে হবে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘ইচ্ছে’।

সুমিত্রা ভট্টাচার্যের ‘ইচ্ছের গাছ’ গল্পকে সিনেমায় রূপ দিয়েছেন নবীন পরিচালক শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও নন্দিতা রায়। শিবপ্রসাদ প্রথমে ছিলেন অভিনেতা। তারপর হলেন অ্যাঙ্কর। এবং বছর তিনেক আগে এই ছবিটা তিনি শেষ করেন। তিন বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তাঁকে। তবে এখন বাংলা ছবির দু'টি ধারা সমানভাবে চলছে। একদিকে শত্রু, পাগলু, অচেনা প্রেমের মতো কর্মাশিয়াল ছবি; অন্যদিকে রঞ্জনা আমি আর আসবো না, মনের মানুষ, অটোগ্রাফ-এর মতো অন্যধারার বাংলা ছবি— দুই-ই দর্শক টানতে সক্ষম হচ্ছে। তাই শিবপ্রসাদের ‘ইচ্ছে’র বাংলা ছবির এই আবহাওয়ায় দর্শক আনুকূল্য পেতে অসুবিধে হয়নি।

প্রথম সুযোগেই এমন একটা বিষয় নিয়ে ছবি করার জন্য পরিচালকদ্বয়কে সাধুবাদ জানাবো। সেই সঙ্গে চরিত্রচিত্রণে মায়ের ভূমিকায়— অর্থাৎ মমতার চরিত্রে গ্রুপ থিয়েটারের অভিনেত্রী সোহিনী সেনগুপ্তকে বেছে নেওয়ায় তিনি যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। গোলগাল ভারী শরীর নিয়ে ছ'বছরের বাচ্চার মা থেকে ইউনিভার্সিটির ছাত্রের পজেসিভ এক মায়ের চরিত্রে মধ্য ত্রিশের এই অভিনেত্রী এক কথায় অনবদ্য। সন্তানের ওপর নিজের স্বপ্নের বোঝা— ‘ইচ্ছে’র ভার চাপিয়ে দেওয়ার যে মানসিকতা— তা এক একসময় পাগলামির পর্যায়ে চলে গেছে। সোহিনীর অভিনয়ে সেই ক্ষ্যাপাটে মা যেন বাস্তবে রূপ পেয়েছে। এই চরিত্রে সোহিনী ছাড়া যেন কাউকে ভাবাই যায় না। স্বামীর ভূমিকায় ব্রাত্য বসু খুব পরিণত অভিনয় করেছেন। অফিস থেকে ফিরে তাসের আড্ডায় ছোটা, ক্লাস নাইনের ছেলেকে কোন্ ক্লাসে পড়িস, জিজ্ঞাসা করার মধ্যে দিয়ে এক উচ্চাশাহীন মানুষকে তিনি বেশ ভালোই তুলে ধরেছেন।

অবাক করেছেন ছেলের ভূমিকায় সমদর্শী

ছেলে সমদর্শী দত্ত

দত্ত। এর আগে নিউ থিয়েটার্সের আদু ছবিতে নায়কের ভূমিকায় ওকে দেখেছি। এই ছবিতে সমদর্শীর অভিনয় যেন এক অন্য মাত্রা পেয়েছে। বন্ধুদের সামনে তাকে ছোট করার মায়ের চেষ্টা, কথায় কথায় অন্য সকল ছাত্রদের সঙ্গে তার তুলনা টানা— এ সব যেন তার মধ্যে এক হীনমন্যতার জন্ম দিচ্ছে। সমদর্শীর অভিনয় যেন বাস্তবের শমীকদের তুলে ধরেছে।

চমৎকার সুর দিয়েছেন ব্যান্ডের সফল গায়ক সুরজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর নিজের গাওয়া ‘ও মন’ গানটি ছবির সিচুয়েশন অনুযায়ী অপূর্ব। যন্ত্রসঙ্গীতের দাপট একটু কম হলে ভালো হোত। রূপম ইসলামের গানের প্রসঙ্গেও ওই এক কথা বলা যায়। এ ছবির অন্যতম নিবেদন বাংলা ছবির অন্যতম সফল নায়িকা ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। নতুন পরিচালকদ্বয়ের পরীক্ষামূলক ছবির পাশে দাঁড়ানোর জন্য ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য।

শব্দরূপ-৫৯১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

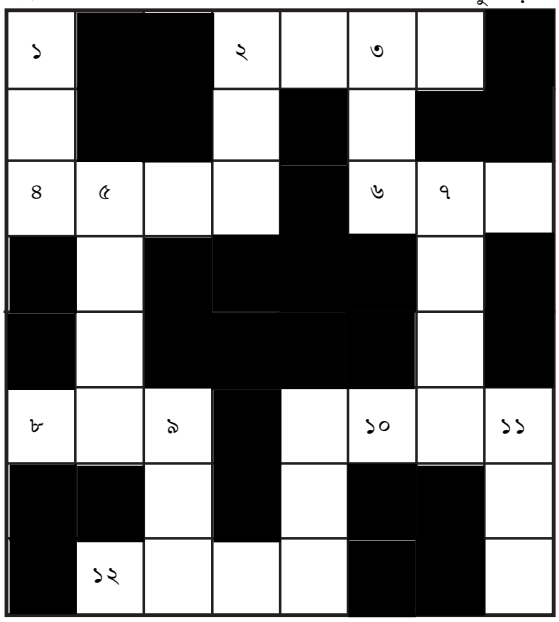

সূত্র :

পাশাপাশি : ২. প্রেতোদ্দিষ্ট-দান গ্রহণকারী পতিত ব্রাহ্মণ, ৪. বাণভট্ট প্রণীত কথাগ্রন্থ বিশেষ, ৬. হাঁড়ি, বড় পাতিল, প্রথম দু'য়ে রাধা, ৮. গুজরাটী নৃত্যগীত, ১০. সারথি, কর্ণের পালকপিতা, ১২. মহারাজ অশোকের পিতা, মগধরাজ।

উপর-নীচ : ১. কাশীরাজের দ্বিতীয়া কন্যা, ধৃতরাষ্ট্রের মাতা, ২. আংটি, ৩. ফৌজদারী উচ্চ আদালত বসিবার কাল, ৫. ফণাধর সর্প, ৭. নীল পদ্ম, ৯. অমাবস্যার পরে দৃষ্ট নব চন্দ্রকলা, ১০. সরল, কৃষ্ণের পিতৃব্য, ১১. থামিয়া থামিয়া চলা, গজেন্দ্র-গমন।

সমাধান
শব্দরূপ-৫৮৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

প	■	বা	ম	ন	■	কু	■
লি	■	স	■	ক	রা	লী	■
ত	ক্ষ	ক	■	ল	■	র	■
কে	■	■	■	■	ত	ক	মা
শ	কু	নি	■	■	■	■	হে
■	ম্ভি	■	পি	■	গ	জে	ন্দ্র
■	ল	হ	না	■	রি	■	ক্ষ
■	ক	■	ক	ম	লা	■	ণ

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫৯১ সংখ্যার সমাধান আগামী ২২ আগস্ট, ২০১১ সংখ্যায়

।। চিত্রকথা।। সর্প যজ্ঞ।। ১৪

Swastika RNI No. 5257/57
1 August - 2011
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

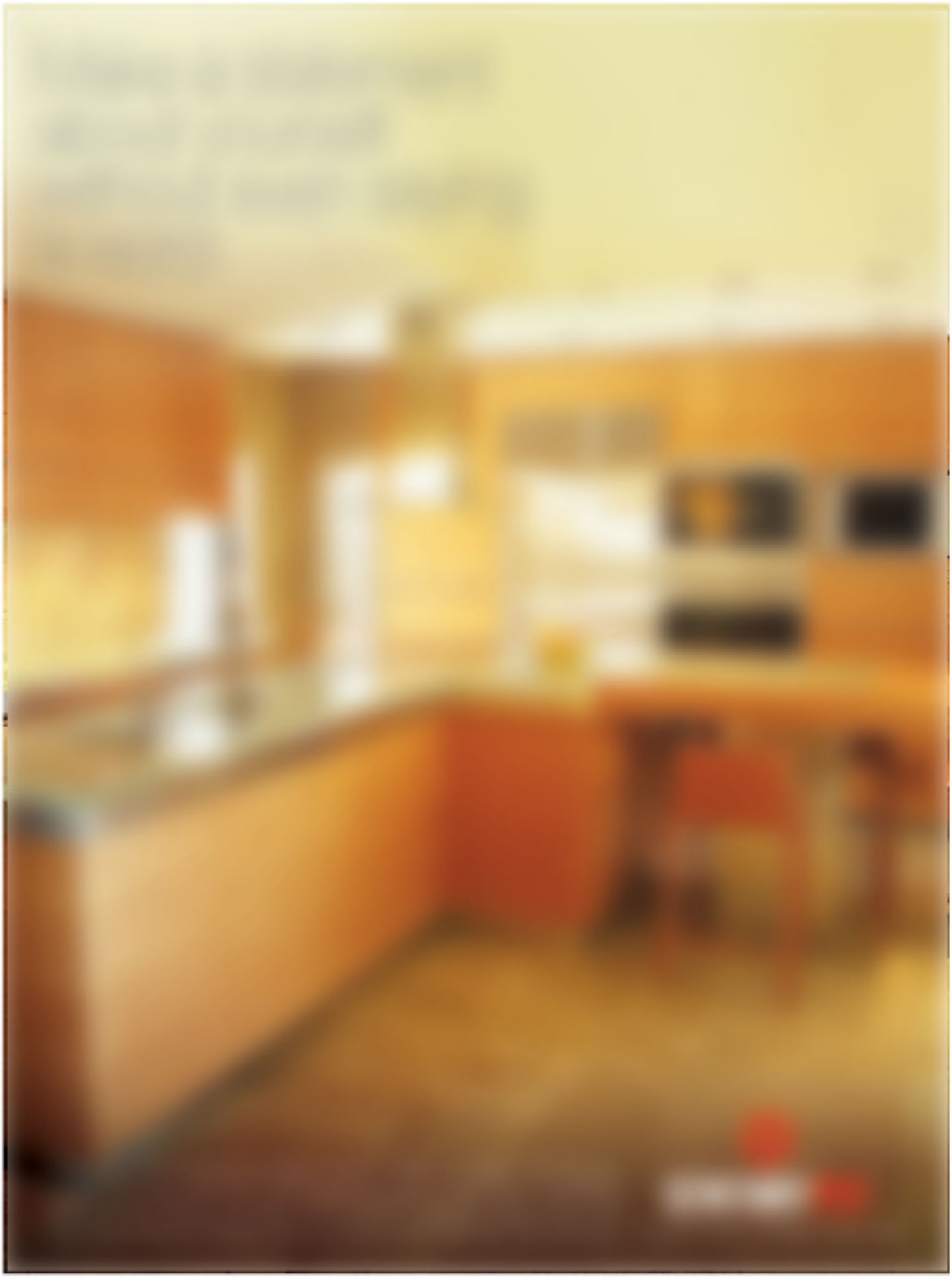

দাম : ৫.০০ টাকা